KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No KLMLGK 2001	Place of Publication : ৫, [illegible] বসু লেন, কল-৩৯
Collection KLMLGK	Publisher সুব্রত সংহেরবার্ডিয়া
Title অন্তরীপ (ANTAREEP)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 3/3 3/4 12 12	Year of Publication : আষাঢ় সংকলন ১৩৮৫ 1988 May 1990 May 1991
	Condition : Brittle Good
Editor সুব্রত সংহেরবার্ডিয়া	Remarks

CD Reel No KLMLGK

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির পাবলিক লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০০০৫

শব্দরীপ

ত্রৈমাসিক
সাহিত্য পত্র

সাহিত্য
সাম্প্রতিকী সংখ্যা

সম্পাদনা
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ

বেলজিয়ান কবি মরিস কারেমের কবিতা ০ সাম্প্রতিক কবির লড়াই ০ প্রেমেন্দ্র মিত্র ০ সমরেশ বসু ০ সমর সেন ০ অমিয়ভূষণ মজুমদার ০ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ০ দূরদর্শনে 'তমস' ০ নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ।

লিখছেন

জীবনানন্দ দাস নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ব্রত চক্রবর্তী গৌতম সেনগুপ্ত দীপক মিত্র নিখিলেশ গুহ মিতা নাগ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমোদ বসু সুজিত সরকার বিশ্বনাথ গরাই সুভাষ মজুমদার বিবস্বান ভট্টাচার্য অসিত মৈত্র মলয় দে অর্ণব রায় শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

পত্রপুট

সংকলন ঃ ২১ শরৎ-হেমন্ত ১৩৯৪

লিটল ম্যাগাজিন ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়

অমিয়ভূষণ মজুমদার

প্রসঙ্গে

এক যত্নবান সম্ভার

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

আপাতত কবিদের মধ্যে লড়াকু মেজাজ তুঙ্গে। বাণিজ্যনির্ভর সর্বাধিক প্রচারিত একটি সাপ্তাহিকে কয়েক মাস আগে দুজন প্রাতিষ্ঠানিক কবি-ব্যক্তিত্বের পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের সম্পর্কে উচ্চারিত কিছু বেদরদী, দায়িত্ববর্জিত ও তরল মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এখন লিটল ম্যাগাজিনগুলো পর্যন্ত আলোড়িত ও উত্তেজিত।

এর সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রশ্ন অনেক।

বিশেষ সংখ্যায় নিবেদিত এই কবির লড়াই কি অনেকটাই কৃত্রিম ও কপট ছিল না? এবং সেই সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন কি তাঁরা ছোট কাগজে প্রকাশ করার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন? পারেননি বলেই না তাঁদের একান্তভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছিল নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের একটা বাণিজ্যিক মোড়কের আড়ালে? এবং তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা যারা চূড়ান্ত আর্থিক দৈন্যের শিকার হয়েও ছোট পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরে অহংকারী, এতে এত অহেতুক উত্তেজিত হব কেন? হ'য়ে কেনই বা পাতার পর পাতার নিঃসীম অপচয় ঘটিয়ে উদ্যোগ নেব এরই ওপর বিশেষ সংখ্যার জন্য? প্রতিবাদ? তাহলে তো বাণিজ্যিক পত্রিকায় নকলযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যে দুজন অসিচালনা করলেন, তাই নিয়ে ছোট কাগজের এই যে অকারণ উত্তেজনা, বেমানান বিতর্ক,—এরও প্রতিবাদ প্রয়োজন। আসলে বিতর্কিত হতে গিয়ে তাঁরা কি তাঁদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তার দায় মেটাতে গিয়েছিলেন ওই সুলভ পথে, চমক-জাগানো পন্থায়? বরং ভাবলে একটু আহতই হতে হয়, যাঁদের আমরা সাহিত্যজগতে অজস্রপ্রসূ হিসেবে জানি, যাঁদের কবিকৃতির ওপর আমাদের আস্থা আছে অগাধ, অফুরন্ত অবাঞ্ছিত ফসলের পথ বেয়েও যাঁদের হাতে জেগে উঠতে পারে এই এখনো কিছু কবিতার অপূর্ব নির্মাণ, যাঁদের লিটল ম্যাগাজিননির্ভর খ্যাতিটাও কিছু কম নয়, সেই তাঁদের কাছে পরবর্তী প্রজন্ম কি আরো একটু বেশী ঔদার্য, সহিষ্ণুতা ও সংস্কারমুক্তি প্রত্যাশা করতে পারে না?

আর কিছু নয়, কোনো কবিকে আহত হওয়াটাই মানায়, অভিমানী হতে গিয়ে সে কেন অভিযোগ দায়ের করবে, আস্ফালনে লড়াকু কেন হবে সে, চরিত্র বিসর্জন দিয়ে উত্তেজনায় গা ভাসিয়ে কেন সে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করবে অ-কবি হিসেবে?

মরিস কারেমের কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মরিস কারেমের কথা আমি ঘটনাচক্রে জানতে পারি। ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে, ভারত-উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত কবি-সম্মেলনে আহূত হয়ে, দিন কয়েকের জন্য প্যারিসে যাই। সেখান থেকে কাজের সূত্রে ব্রাসেল্‌সে যেতে হয়। কবি সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে প্যারিস-প্রবাসী। ব্রাসেল্‌সে পৌঁছে আমাকে খুবই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত, সুপ্রিয় যদি না প্যারিস থেকে ইতিমধ্যে শ্রীমতী জানিন্ বুর্নিকে আমার যাওয়ার কথা জানিয়ে রাখতেন। এই বেলজিয়ান ভদ্রমহিলার কাছেই আমি কবি মরিস কারেমের কথা প্রথম শুনি।

মরিস কারেম বড় মাপের কবি। ১৮৯৯ সালে তাঁর জন্ম। ১৯৭২ সালে ফরাসি লেখকদের এক কমিটির ভোটে তিনি 'প্রিন্স ইন পোয়েট্রি' নির্বাচিত হন। তাঁর আগে অন্য-কোনও বেলজিয়ান কবিকে এইভাবে সম্মান জানানো হয়নি। কারেমের নাম শুনবার পরে ব্রাসেল্‌সে আরও অনেককে তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। প্রায় একবাক্যে সবাই আমাকে জানান যে, কারেম অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির কবি; তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয় যেন একটি মানুষের অন্তরের অনুচ্চারিত কথাগুলিও আমাদের কানে এসে বাজছে।

মরিস কারেম সম্পর্কে আমার আগ্রহের অবশ্য আরও একটি কারণ রয়েছে। জানিন্ আমাকে ব্রাসেল্‌সে এই কবির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন একটি ফাউণ্ডেশনের হাতে। কবির জীবনের সঙ্গে যা-কিছু ছিল সম্পর্ক-সূত্রে বাঁধা, তা এখানে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে; কোনও-কিছুই নষ্ট হতে দেওয়া হয়নি। এই বাড়িতেই, কারেমের লাইব্রেরিতে, অসংখ্য বইয়ের মধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথেরও বেশ-কিছু বই দেখতে পাই। সবই রবীন্দ্ররচনার ফরাসি অনুবাদ। বইগুলি উল্টেপাল্টে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কারেমের আগ্রহ খুব অল্প ছিল না। হরেক পৃষ্ঠায় হরেক পঙ্‌ক্তিকে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন, এবং মার্জিনে যেভাবে

লিখে রেখেছেন তাঁর বক্তব্য, তাতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁকে গভীরভাবে টেনেছিল।

কারেম ফরাসি ভাষার লেখক। তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরেই ফরাসি সমালোচকদের দ্বারা বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হয়েছিল, ইংরেজি তর্জমায় তার নাম দেখছি 'সঙ্গ্‌স অভ্ বিগিনিংস'। শুনে 'প্রভাত সংগীত'-এর কথা মনে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমি ফরাসি জানি না। তাই অনুবাদের জন্য আমাকে জো লান্‌টেলমি বেল্‌থের ইংরেজি তর্জমার শরণ নিতে হয়েছে।

জননী

মরিস কারেম

তোমারই মধ্যে আমি ছিলুম।
নির্মল একটি পাত্রের মধ্যে
টলটলে এই একটুখানি
জল যে-রকম থাকে।

তোমার চোখই তখন আমার হয়ে দেখছিল।
আমার হয়ে হাঁটছিল তোমার পা। আর
আমারই যন্ত্রণা সহ্য করছিল তোমার শরীর।

আমারই জন্যে খাটতে-খাটতে যা ক্লান্ত,
সেই হাত দুখানিকে তুমি তখন বিশ্রাম দিতে
আমারই উপরে রেখে।

আমার হয়ে যখন ধ্বনিত হচ্ছিল তোমার হৃদ্‌যন্ত্র,
ঠিক তখনই তোমার রক্ত দিয়ে আমার
হৃৎপিণ্ড তুমি গড়ে তুলছিলে।

মাগো, কত মেয়েই তো দেখি,
কিন্তু
তোমার কোনো তুলনা খুঁজে পাই না।

স্মরণীয়েষু : প্রেমেন্দ্র মিত্র

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কল্লোলিত বাংলাসাহিত্যের শেষতম বেদনা, সাম্প্রতিকতম শোক—প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রয়াণ। অকালপ্রয়াণ নয় যদিও, তবু আরেক ইন্দ্রপতনের সাক্ষ্য হতে হল আমাদের। শোকেরই আবহে দিন কাটছে। ক্রমশ অভাবী, নিঃস্বতর হয়ে যাচ্ছি আমরা। বিয়োগ মিছিলের যেন শেষ নেই। কত অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর বিদায় নিলেন সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু—কবিতা ও কথাসাহিত্যের এক-একজন বিরল ব্যক্তিত্ব। কবিতা আরো রিক্ত হল, ছোটগল্প দীনতর হল, উপন্যাস হারালো একজন নতুন পথের খাঁটি দিশারীকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদায় সর্ব অর্থেই দরিদ্র করে দিয়ে গেল সাহিত্যকে। কোনো শাখাই অস্পর্শিত ছিল না তাঁর প্রতিভায়। কবিতা, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান, চলচ্চিত্র এবং সর্বোপরি ছোটগল্প—সমস্ত ক্ষেত্রেই অবাধে বিচরণ করেছেন তিনি, দুর্লভ দাপটে, নিঃসীম দক্ষতায়, দীর্ঘ পরমায়ুধন্য হয়ে। 'কবিতার কথা'য় জীবনানন্দের প্রেমেন্দ্র-স্বীকৃতি ছিল বড় আন্তরিক ও অকুণ্ঠ : 'প্রেমেন্দ্র বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য নামঞ্জুর করেননি; অনেক বিচিত্র চক্রবাল থেকে কিরণ এসে সেখানে মিলেছে যদিও। সুধীন্দ্রনাথের মতন নিরাশার কেন্দ্রে তিনি অতটা আত্মস্থ নন। সুধীন্দ্রনাথ তটভূমি খুঁজে পেয়েছেন—প্রেমেন্দ্র সমুদ্রপ্রেমিক নাবিকের মতো—অতিবেল তরঙ্গের উপর দিয়ে ভূগোল ও মানুষের ইতিহাস, ও অতিপৃথিবীর আকাশ চিনে, আধো চিনে, রৌদ্রপটবেলাভূমি সহসা লক্ষ্য করে আবার হারিয়ে ফেলে—এ জীবনকে সময়ের কাছে ঋণী রেখে, নিরন্তর সময় কাটিয়ে চলেছেন। যে বৃহত্তর জীবনের ব্যাপ্তির জন্য সাগর থেকে ফেরা এই কবি সুদূর জাহাজের ডাক শুনে উচ্চকিত হন, প্রেমের অভিজ্ঞতার মধ্যেও সেই বৃহৎ ব্যাপ্তিই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত : 'ছিঁড়ে যাক জীবনের ঘাটে বাঁধা নোঙর! / কূলহীন সমুদ্র, / দিগন্তহীন আকাশ, / তুমিত আমার সে—ই!' —'সৌরভ' : সম্রাট।

ছোটগল্পে তাঁর স্বাক্ষর রয়ে গেল অমলিন, কি বিষয়ের টাটকা স্বাদে, কি আঙ্গিকের অপূর্ব মুন্সিয়ানায়। 'শুধু কেরানী' দিয়ে সেই যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, তারপর দীর্ঘ সময়সূত্রে 'গোপনচারিণী', 'জল পায়রা', 'মহানগর', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'সংক্রান্তি', 'স্টোভ', 'হয়তো', 'ভস্মশেষ', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার',—এইরকম কালোত্তীর্ণ গল্পমালায় তাঁরই হাতে ঋদ্ধতর হয়েছে বাংলা ছোটগল্পের ঐশ্বর্য। অনিবার্য লিপিকুশলতায়, কাব্যিক স্বাদে ও অনবদ্য প্যাটার্ণ-সময়য়ে এক-একটা গল্পে অনাবিকৃত উন্মোচনের বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভূতি। ছোটগল্প সম্পর্কে তাঁর নিজের নির্ধারিত সংজ্ঞায় এ-কথারই প্রতিফলন ঘটেছিল এক সময়ে : 'ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের জীবন বিস্ময়বৈচিত্র্য ও রহস্যে সমুদ্রের চেয়েও অসীম, অগাধ ও অতল। সে অসীম অতলতার স্বাদ সমস্ত সমুদ্র নিঃশেষে পান করে অগস্ত্য হওয়া আমাদের বোধহয় সম্ভব নয়। প্রয়োজনও বোধহয় নেই। জীবনের অগাধ সমুদ্র রহস্যের স্বাদ গণ্ডুষে দেবার ক্ষমতা যা রাখে তাই হল সার্থক ছোটগল্প।'

মগ্নচৈতন্যের গূঢ় রহস্য—যা তাঁর ছোট গল্পে অবিরল উন্মোচিত—কবিতায়, অন্তত 'প্রথমা'-র যুগে, তেমন স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি উদ্ঘাটন করতে পারেন নি, এটা সত্য; কিন্তু 'সম্রাট' কাব্যগ্রন্থে তিনি আশ্চর্য গভীরতায় ডুব দিয়েছেন অবচেতনে, প্রতীকের অন্তরালে, ব্যঞ্জনার মোড়কে :

'কত যে সাগর আছে;
কতদূর পৃথিবীর তটে
আছাড়িয়া পড়ে রাতদিন।
আমি জানি তার চেয়ে
উতল সাগর এক,
—তার মাঝে চেতনা বিলীন'

('কালরাত' : সম্রাট)

বড়দের জন্য চিহ্নিত ছোটগল্পের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সহাবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর কল্পবিজ্ঞানপ্রসূত গল্পগুচ্ছ, শিশুসাহিত্যের ঝাঁপি ও ঘনাদা-

লিটারেচর। সেই যে বিজ্ঞানী মনের প্রথম ফসল 'কুহকের দেশে',—বাংলা-সাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রথম সার্থক কিশোর উপন্যাস হয়ত বা—তাঁর নিখুঁত নিপুণতাকে তিনি নিজে আর দ্বিতীয়বার অতিক্রম করতে পেরেছিলেন কি? বোধহয় না। গল্প বলতে বলতে গল্প শুনিয়েছেন হাজার রকম: একদিকে 'পিঁপড়ে পুরাণ', অন্যদিকে 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস', একদিকে 'হিমালয়ের চূড়ায়', অন্যদিকে 'খুনে পাহাড়', 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ', 'শয়তানের দ্বীপ'—রাশিকৃত এক জাহাজ গল্প। আর এসবের পাশে তাঁর অদ্বিতীয় ঘনাদা ও গোয়েন্দা পরাশর বর্মা। অজস্র বিজ্ঞানগন্ধী কল্পকাহিনীও ছড়িয়ে আছে ঘনাদা-সাহিত্যে। বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত জ্ঞানকে ঘনাদার দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে বিচিত্র পরিবেশে তুলে ধরেছেন তিনি। নির্দ্বিধায় বলা যায়, পরবর্তী শিশুসাহিত্য ও কিশোর রচনায় টেনিদা, ব্রজদা ও ফেলুদার আদিপুরুষই হলেন অবিস্মরণীয় এই ঘনাদা।

কি ছিল না তাঁর সৃষ্টিকর্মের ঝুলিতে? চলচ্চিত্র পরিচালনায় দক্ষ হাতে একসময়ে উপহার দিয়েছিলেন 'পথ বেঁধে দিল', 'কুয়াশা', 'হানাবাড়ি', 'ডাকিনীর চর', 'চুপি চুপি আসে'—অন্তত খান-পনেরো বাণিজ্যিক সফল ছবি তাঁর নির্মিত চিত্রনাট্যে একদা সমৃদ্ধ হয়েছিল 'ওরা থাকে ওধারে', 'কাবুলিওয়ালা', 'সদানন্দের মেলা', 'হাত বাড়ালেই বন্ধু', ইত্যাদি আরো অনেক সফল উত্তীর্ণ ফিল্ম-কাহিনী; কমপক্ষে পঁচিশটা ছায়াছবির গীতিকারের ভূমিকায় সার্থক স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর। কম আলোচিত হলেও তাঁর কিছু উপন্যাস অন্তত কম উল্লেখনীয় নয়। 'পাঁক', 'মিছিল', 'সূর্য কাঁদলে সোনা', 'অমলতাস', 'আগামীকাল'—সত্যের অনুসন্ধিৎসায়, জীবনযন্ত্রণায়, সংযতকথনে ও বক্তব্যের বিশালতায় প্রত্যেকটিই স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।

গত ৩রা মে, ১৯৮৮, মঙ্গলবার এই বহুমুখী কবি ও কথাসাহিত্যিককে আমাদের বিদায় জানাতে হল। সেই সঙ্গে শতাব্দীর প্রায় প্রান্তদেশে এসে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন কল্লোল যুগের শেষতম প্রতিভূ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যাঁদের কাছে হাজারবার ঋণ স্বীকার করেও কৃতজ্ঞতা জানানো শেষ করতে পারবে না, প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসংশয়ে তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

"এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?" নিজেকে জিজ্ঞেস করলুম। 'মনে হচ্ছে, পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, ডুবে যাচ্ছি।' সে বলল। জবাবে শক্ত আর গম্ভীর মুখে তাকে বললুম, 'যা বললে, তা বলা দূরে থাক, ভাববেও না। বাস্তবে অবস্থা যাই হোক, ডুবছি ভাবলে ডুববে। বরং চিন্তা করো উঠতে হবে, উঠতেই হবে, আর পন্থার কথা ভাবো, কোথায় কী ভাবে'।.....

□

"সাহিত্যিককে বেঁচে থাকতে হয় কেবল জৈবিক ভাবে না, আরো বহুতর বাধার বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে রাজনীতি, এমনকি আত্মার আত্মজনরাও বাধার ব্যূহ রচনা করে। জটিলতা বাড়ে, সৃষ্টি নতুন দিগন্তের সন্ধান করে, আর প্রতিষ্ঠা সংগ্রামকে তীব্রতর করে, কেবল বাইরে না, ঘরেও।"

শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকায়—**সমরেশ বসু**

আমার লড়াই অন্ধকারের বিরুদ্ধে: সমরেশ বসু

ব্রত চক্রবর্তী

সমরেশ বসু ওরফে কালকূটের সঙ্গে আমার বার তিন-চার দেখা হয়েছিল। কিংবা হয়নি। দুটো-চারটে-ছটা কথা হয়েছিল। কিংবা হয়নি। তবু, তাহলে, এই লেখা কেন? জবাব হল, লিখতে ইচ্ছে করছে। ভাল লাগছে। কার্যকারণ না থাকলেও স্রেফ ভাল লাগার জন্যও তো মানুষ কত কিছু করে! সমুদ্র পাহাড়ের কাছ থেকে ফিরে যে যার মত তার বিস্ময়, আনন্দ, ভাল লাগা অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করে। করে না? আমি না হয় তা-ই করলুম। দোষের কিছু হল? হোক্। ভাল লাগছে।

একবার হাওড়ার এক প্রেক্ষাগৃহে সম্বর্ধনা সভায়, একবার নৈহাটির কবি সম্মেলনে, একবার বিমল চন্দ্র বসাকের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে, আর শেষমেষ একবার বইমেলায়। স্মৃতির আগ্‌ফা ক্লিকে তোলা এই চারটে ছবি আমার। মগজের ভি. ডি. ও. তে এখন আরেকবার দেখছি। ভাল লাগছে।

বোধহয় '৭৫ কি '৭৬ সাল হবে। সবে লেখা শুরু করেছি। হাতে খড়ি হয়েছে অল্প এক-দুই বছর। আগুন, যে খাদ ঝরিয়ে সোনা খাঁটি করে, তার থেকে অনেক দূরে তখন। কিন্তু তাকে চিনতে পারি। তাকে দেখলেই শ্রদ্ধায় কপালের কাছে হাত স্যালুটের ভঙ্গীতে চলে আসে। ফলে বন্ধুরা মিলে ঠিক করলুম বিবর-এর লেখককে হাওড়ায় এনে সম্বর্ধনা দেব। বড়রা বাধা দিয়ে বলল, অন্য কাউকে দাও। ওইরকম একজন অশ্লীল (বিবর-এর জন্য সমরেশ বসু তখন বিতর্কের তুঙ্গে) লেখককে সম্বর্ধনা না-ই দিলে! আরও তো কত্ত রয়েছে, দাও না—।

বাধা। কিন্তু না, আমাদের জিদ, সমরেশ বসু। ফলে এক সকালে সবান্ধব সার্কাস রেঞ্জের ফ্ল্যাটে উপস্থিত। দেখা হল। সবিনয়ে জানালুম আমরা আপনাকে আগামী ৭ তারিখ পেতে চাই। হাওড়ায়। যেতেই হবে। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওই ৭ তারিখ উনি থাকছেন না। লেখার জন্য মাসখানেক বাইরে যাচ্ছেন। কথাবার্তা সব পাকা হয়ে আছে। সুতরাং—। একপলকের দ্বিধা, তারপরই মুখ ফস্‌কে মিথ্যেটা বেরিয়ে গেল, কিন্তু আমরা যে কার্ড ছাপতে দিয়ে দিয়েছি। তাহলে? মিথ্যেটা স্পষ্টই বুঝলেন। কিন্তু কপালে ভুটো-তিনটে ভাঁজ পড়তে-না-পড়তেই মিলোল। তারপরই ঠোঁটে হাসি, মৃদু গলায় বললেন, তোমাদের সঙ্গে আর কেউ আছে? বড় কেউ?

আমরা সঙ্গে সঙ্গে, না না আর কেউ নেই। আমরা, স্রেফ আমরা। অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলেন ক্ষুদে সম্বর্ধনাদাতাদের দলটাকে। তারপরই ঘাড় কাৎ, বেশ, পরে আরেকদিন এসো। সম্মতি পেয়েই আমরা দুদ্দাড় দৌড়ে, সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায়। হিপ হিপ হুররে···।

বোধহয় মার্চ মাসই হবে। মার্চের ৭ তারিখ। তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে। হলের সামনে সমরেশ বসু গাড়ী থেকে নামছেন, ধুতি-পাঞ্জাবীতে চমৎকার, সেই সময় ছোট্ট একটা মজা হল। পাঞ্জাবী ড্রাইভার তার গাড়ী থেকে নেমে যাওয়া উজ্জ্বল সওয়ারীকে শেষবারের মত একবার দেখে নিয়ে গলা নীচু করে আমার কাছে জানতে চাইল, খোকাবাবু, উস আদমী কোনো ফিল্ম ষ্টার আছে? আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসি লুকিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ষ্টার তো বটেই।

বলেই হলের বাইরের দেওয়ালে 'চলিতেছে' ছবির পোষ্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ওনারই তো ছবি চলছে এ-হলে এখন। সাচ? বিস্ময়ে, আনন্দে আর উত্তেজনায় ড্রাইভার বেশ অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর অপসৃয়মান সমরেশ বসুর দিকে বাও করে গাড়ীতে ষ্টার্ট নিল। স্পষ্ট মনে আছে।

মোটমাট অনুষ্ঠান এইরকম: সমরেশ সম্বর্ধনা, প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তি আর সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত'। হল ভর্ত্তি। সম্বর্ধনার পর মাইক্রোফোনে এলেন সমরেশ বসু। গোটা হল করতালিতে আরেকবার সম্বর্ধনা জানাল লেখককে। আমি প্রায়ান্ধকার হল ঘরে সেই শুভানুধ্যায়ীদের খুঁজছিলাম, যারা বলেছিলেন আরও তো কত্ত লেখক আছে। সম্বর্ধনা? দাও না তাদেরই কাউকে—। 'আমার লড়াই অন্ধকারের বিরুদ্ধে', এই বলে কথা শুরু তাঁর, গোটা হল চুপ, 'আমি অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে লড়তে চাই তার সঙ্গে। চাই তার ভেতরের আলো বের করে আনতে।' অল্প দু-চার কথা। শেষ হতে আবার করতালি।

আর সব ভুলে গেছি। কিন্তু ১। আমার ২। লড়াই ৩। অন্ধকারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট মনে আছে। বরাবরের ঝিনুকে বরাবরের উজ্জ্বল মুক্তো হয়ে।

অনুষ্ঠান শেষ। হল ম্যানেজারের ঘরে এরপর চা-পর্ব। মিষ্টির ভাঁড় থেকে প্লেটে মিষ্টি রাখতে যাব, উনি সঙ্গে সঙ্গে, এই খবর্দার, একটাও গোলাগুলি ছুঁড়বে না আমার দিকে। তথাস্তু। স্রেফ চা আর একটা মিষ্টি। হলে তখন 'অপরাজিত' শুরু হয়েছে। যাবেন একবার? অনুরোধ করতেই হেসে, খুব ইচ্ছে করছে। যদিও ছবিটা আমার বার তিনেক দেখা। মিনিট পাঁচেক হলের ভেতর বসলেন। তারপর বাইরের বারান্দায়, একা। বন্ধুরা নীচে গেছে গাড়ির ব্যবস্থা করতে।

হঠাৎ হাত তুলে আমাকে ডাকলেন।

—কিছু বলবেন? কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

—তুমিও তো লেখো?

সলজ্জ ঘাড় কাৎ, হ্যাঁ।

—কী লেখ? গল্প না কবিতা?

—কবিতা।

—বেশ। কিন্তু—

—কিন্তু কী? মুখ তুললুম।

উনি গলা নামালেন, চাপা গলায় ফিসফিস করে, মন দিয়ে লেখ। আর, শরীরটার দিকে একটু নজর দিও। নিজের দিকে। বড্ড রোগা শরীর। একটু যত্ন নিও। সামনে যে অনেক যুদ্ধ এখনও বাকী।

আর—।

আরো কী যেন বলতে যাবেন, তার আগেই বন্ধুরা হৈ হৈ করে এসে জানান দিল, গাড়ী এসে গেছে। ফলে কথা থেমে গেল।

ঘুরে দাঁড়ালেই এখন মনে হয়, আর—বলে তিনি যেখানে থেমেছিলেন, সেই লম্বা টানা ড্যাশ, তারপর আর কী ছিল? কী বলতেন? এখন, এই উনিশশ অষ্টআশিতেও রাগ পড়েনি বন্ধুদের ওপর। যদি তারা আরও কিছুটা দেরী করে সেদিন গাড়ীর খবর নিয়ে আসত!

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা-সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ

এক সময় দুই কবি

পপুলার লাইব্রেরী ॥ ১৯৫/১বি, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

৫·৫০

প্রসঙ্গত কবিতা

মাঝি প্রকাশনী ॥ ৭, সুকিয়া রো, কলকাতা-৬

পরিবেশক : দে'জ বুক ষ্টোর্স

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

২০·০০

নিয়ম-ভাঙ্গার কারিগর

গৌতম সেনগুপ্ত

যে কোনো বড় মাপের লেখকই তৈরী হয়ে ওঠেন নানা দ্বন্দ্বে হোঁচট খেতে খেতে। সীমানা সংকীর্ণ নয় বলেই, বৈচিত্র্যই তাঁদের বৈভব। সরলরেখায়-বাঁধতে-চাওয়া সমালোচক-মন যতই বিক্ষুব্ধ হয়, ততই বাড়ে তাঁদের নিয়ম-ভাঙার খেলা। এই প্রাণবন্ত খেলারই বড়ো অভাব আজকের বাংলা কথাসাহিত্যে। প্রথাকে ভাঙতে এসে অনেকেই নতুনতর প্রথার অচলায়তনে আটকে পড়েছেন। তেরশ' চুরানব্বই-এর চৈত্র সন্ধ্যায় সমরেশ বসুর প্রয়াণ সে অচলায়তন থেকে পঞ্চককে কেড়ে নিয়ে গেল।

২

লেখক সমরেশের বিবর্তন নিয়ম-ভাঙার নিত্যনবীন খেলায়। সব বড় লেখকের মতই তিনি নিজেও নানা ভিন্ন পথে জীবনের গভীরে যেতে চেষ্টা করেছেন। সাম্যবাদী রাজনীতির দীক্ষায় যখন লেখকজীবনের শুরু, মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবন তখনই সমস্ত দরদ দিয়ে আঁকা তাঁর লেখায়। 'আদাব', 'বি, টি, রোডের ধারে' এ-সব লেখার মাধ্যমে নিছক গল্প বলার স্তর পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিল একঝলক তাজা বাতাস। খেটে-খাওয়া মানুষ ঘামে-রক্তে ভেজা শরীর নিয়ে এখানে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। কল্লোলের পরের কালে এ-হেন বলিষ্ঠ উপস্থিতি তাদের আর কে দিয়েছে?

ওইখানে শুরু হয়তো, কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে। একটা কোনো বিশেষ রঙে জীবনকে দেখার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে তিনি সমকালের মানুষকে তাদের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণায়-প্রেমে আদ্যন্ত বুঝতে চেয়েছেন। কোনো মতবাদের চশমা নয়, তাঁর কাছে 'মানুষই রতন'। তাই কোনো পথে হেঁটে যেতেই তাঁর আপত্তি নেই। ব্যারাকপুর-নৈহাটির কল-কারখানা বা বস্তী থেকে, কোলকাতার কৃত্রিম মূল্য-বোধের নাগরিক জীবন বা শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা কিংবা লক্ষ মানুষের

আবেগে শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে-অপ্রাপ্তিতে উত্তাল কুম্ভমেলা—কোনোখানেই তাঁর অনীহা নেই জীবনকে পরখ করতে, চিনে নিতে। দুঃখ-কষ্ট ব্যর্থতার আড়ালে যে মানুষ নিজেকে নানা প্রবঞ্চনায় ভুলিয়ে রেখেছে, কিংবা অধরা কোনো ঈশ্বরের মাধুরীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনো নারীর প্রেমের দংশনে জ্বলতে জ্বলতে—অনায়াসেই এরা তাঁর নায়ক-নায়িকা হয়। (মনে পড়ে 'অমৃত-কুম্ভের সন্ধানে'-র পাঁচুমামা অথবা 'কোথায় পাবো তারে'-র গাজীকে?) সব থিওরির বেড়াজাল ভেঙে যায়। চটকলের ভোঁ-এর মতই প্রাণবন্ত হয়ে থাকে শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে গরুর গাড়ীর ক্যাঁচ্-কোঁচ্, কিম্বা মেলার একপাশে একাকিনী রিনির কান্না।

৩

সমরেশ বসুকে তাই থিওরি সচেতন সাহিত্য সমালোচক কখনোই বুঝতে পারেন না। রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুবর্তী মানুষেরা তাঁর প্রথম যুগের লেখাকেই 'অনন্য' বলে মাথায় রাখতে চান; 'কালকূট' সমরেশ লক্ষ মানুষের মন ছুঁয়ে গেলেও তাঁদের কাছে ব্রাত্য। আবার তাঁর অতি বড় অনুরাগীও বুঝতে পারেন না, নিছক মন ভোলানোর তাগিদে বছরের পর বছর শারদীয়া সংখ্যায় অর্থহীন সব কাহিনী লিখে যাওয়ার ঘটনাকে। সচ্ছলতা পাওয়ার পরও তাঁর কী খুবই প্রয়োজন ছিল অতি-প্রজননে ক্লান্ত হওয়ার এবং ক্লান্ত করার?

একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা ছিল বুক চিতিয়ে ষাটের দশকের নাগরিক জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার। আধুনিক যুবসমাজের চিন্তাভাবনায় পুরোনো আদর্শের বুলি যেভাবে হাস্যকর হয়ে উঠেছে, 'হ্যাঁ-বোধ' থেকে যেভাবে 'না-বোধের' দিকে নিয়ত চলেছে যাত্রা, অর্থবহ সৃষ্টিশীলতার অভাবে যৌনতা যেভাবে অধিকার করে চলেছে তরুণ মনকে—এই পচনের দলিল লিখতে গিয়েই সৃষ্টি হয় একদা তুফান-তোলা 'বিবর', 'প্রজাপতি' ও 'পাতক'। শিল্প-রূপায়ণে অনেক আতিশয্য থাকতে পারে; হয়তো অনেক অনুচ্চার্য শব্দই বাদ দেওয়া যেত, কিন্তু উপন্যাসত্রয়ীর কেন্দ্রে প্রথার বিরুদ্ধে, প্রচলিত

মূল্যবোধের বিরুদ্ধে, পায়ের তলার মাটিকে ছিন্নভিন্ন করে তোলার যে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা নিটোলভাবে ফুটেছে—সেটিকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজ শরীরের নানা জায়গায় ঘা যখন পচে-গলে পুঁজ রক্তে মাখামাখি, তখন তার দর্শন খুব মনোরম নয়, হয়তো বা বমনোদ্রেককারী—কিন্তু একতিলও মিথ্যে কী? ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে যন্ত্রণার্ত মানুষদের ধরতে চাওয়ার যে আন্তরিক চেষ্টা, তা কি নিছক অশ্লীল বলেই আখ্যাত হয়ে হারিয়ে যাবে?

৪

তাঁর চলার কাছে কোনো পথই অনাত্মীয় নয়। আসলে বোধহয় অন্তরের গহনে তিনি সর্বদাই ছিলেন নিজের ওপরে অসন্তুষ্ট এক শিল্পী। রঙ্-তুলি নিয়ে আঁকছেন, নির্মম নিরাসক্তিতে মুছে দিচ্ছেন পুরোনো আঁকি-বুঁকিগুলো, কখনো-বা ফেলে দিচ্ছেন পুরোনো ক্যানভাসটাই। জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে বসে কখনো উঁকি দিয়েছেন বাউলের আখড়ায়, কখনো বা শবসাধক তান্ত্রিকের অঙ্গনে, কখনো সাঁওতালদের আনন্দোৎসবে। দেশজ সংস্কৃতির গভীরে ডুব দিয়ে খুঁজতে চেয়েছেন গ্রামে গঞ্জে হাটে-বাজারে ছড়িয়ে থাকা হাজারো মানুষের বিশ্বাস, জীবনবোধ আর জীবন-যন্ত্রণাকে। শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণের পরে নামগোত্রহীন সাধারণ মানুষকে এমন দরদী রেখায় আঁকা হয়েছে আর কবে? কবেই-বা বাংলা সাহিত্য সমরেশ-কালকূট দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্বের কাছে এমন বৈচিত্রময় রঙে ঋণী থেকেছে?

এই সমরেশই ফিল্মী পত্রিকায় সদ্যপ্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল মিত্রকে নিয়ে লিখতে পারেন স্মৃতিকথা। ভাস্কর রামকিঙ্করের জীবনকে ফিরে ফিরে দেখতে গিয়ে রচনা করতে পারেন শান্তিনিকেতনের ধূলো-ওড়া পথে বাঙালী সংস্কৃতির আলেখ্য। সচ্ছলতার এবং স্বীকৃতির চূড়ায় উঠেও নিছক গল্প-লেখার জন্যই গল্পলেখায় তাঁর অনীহা কেন? সংস্কৃতির গহনে ডুব দেওয়ার জন্য কেন এই তীব্র আর্তি? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই শুরু হতে পারে ভাবীকালের সমরেশ-পরিক্রমা॥

অ-প্রাতিষ্ঠানিক অমিয়ভূষণ ঃ কাহিনী ও কথায়

দীপক মিত্র

কোন প্রতিষ্ঠানের পোষকতা না নিয়ে একটানা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর একান্ত নিজস্ব চর্চায় যিনি এক অসাধারণ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলেন তিনি অমিয়ভূষণ মজুমদার। গল্প বানানোর নামমাত্র প্রয়াস না রেখে বাংলা কথা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে একই পদবীধারী আর একজন সাহিত্যসেবী স্বকীয় অনন্য ভঙ্গীতে নির্জন স্থানটুকুর স্থায়ী দখল নিয়েছিলেন ; তিনি প্রয়াত কমলকুমার। এঁরা দুজনেই মিহি বা মোটা দাগের কাহিনী শোনানোর চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে চেতনার অতল সমুদ্রে অবতরণ করে আধুনিক মনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে সিদ্ধ হয়েছেন। কমলকুমার বাস্তব জীবনের সংগে পুরাণ, লোকসংস্কৃতি, মধ্যযুগীয় সংস্কার ও লোকাচারকে মিশিয়ে তাঁর অভিনব গদ্যভঙ্গিমায় এমন এক কাব্যিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন যা ধ্রুপদী শিল্পকর্ম বলে মনে হয়। অনুরূপ অমিয়ভূষণের গল্প-উপন্যাসে শুধুমাত্র জীবনের গভীর রহস্যময়তার প্রতিই ইঙ্গিত করে না—আমাদের সাহিত্যবোধকে শুদ্ধ শিল্প চেতনার স্তরে উন্নীত করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাহিত্যে বাস্তবতাকে প্রতিরূপ দেওয়ার ধরনটা ক্রমশ পালটে যেতে লাগল। আমাদের জীবন ও সমাজের চেহারা কথাসাহিত্যে এমনভাবে প্রতিফলিত হল যাতে কঠোর বাস্তবতার প্রতিচিত্রনের ওপর নতুন মাত্রা সংযোজনার প্রয়োজন ঘটে। কেবল সমাজবাস্তবতার নির্মম প্রেক্ষাপটে মানুষের প্রকৃত চেহারা পাওয়া গেল তা নয়, চিন্তাপ্রবাহের উন্মোচনে, অন্তর্লোকের ঘাতপ্রতিঘাতের টানাপোড়েনে এবং স্বপ্ন, কল্পনা ও অনুভাবনার ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে ফুটে উঠল তার সত্য পরিচয়। এই রীতির পথ ধরেই আমাদের আবিষ্কার করে নিতে হয় অমিয়ভূষণের জীবন-নিরীক্ষার প্রবণতা ও কাব্যধর্মী লেখনভঙ্গির অমিত সুষমা। এই অভিজাত মননের সাহিত্যসেবীর কাছ থেকে আমরা প্রথম পেলাম 'গড় শ্রীখণ্ডে'র মত উপন্যাস। পাবনা জেলার পটভূমিতে এক বিস্তৃত ভূখণ্ড নিয়ে ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় থেকে দেশবিভাগের মধ্যবর্তীকালসীমার মধ্যে এই উপন্যাসের ক্লাসিক নির্মাণ।

কোন একটি কাহিনীর একটানা বর্ণনা নয়—অভিনব রূপাঙ্গিকে চারটি কাহিনী পর্ব সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণুতাকে চলমান জীবনদর্পণে প্রতিফলিত ক'রে উপন্যাসটিকে অখণ্ড শিল্পরূপ দান করেছে।

অমিয়বাবুর লেখালিখির শুরু ১৯৪৩-এর কাছাকাছি, কিন্তু পূর্বসূরীদের তৈরী করা ঐতিহ্যের বাঁধা পথে তা নয়। বিদেশী সাহিত্য সুগভীরভাবে অধ্যয়নের ফলে তিনি আবেগবর্জিত বুদ্ধিদীপ্ত মনন আয়ত্ত করেন। এই মননশীলতা প্রয়োগ করে দেশজ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগকে অমিয়ভূষণ কথাশিল্পের ঐশ্বর্যময় নির্মাণকার্যে ব্যবহার করেছেন। প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যপ্রধান পত্রপত্রিকার আনুকূল্য গ্রহণ না করে শুধুমাত্র লিটল ম্যাগাজিনে লিখে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসলকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে ভাষারূপ দিয়েছেন—কমলকুমার ছাড়া এর দৃষ্টান্ত বিরল। এক মহাযুদ্ধের শেষে জন্মলাভ করে আর এক মহাযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে সাহিত্যচর্চার সূচনা করেন। তিনি তাই অর্থ-নৈতিক মন্দা, নিম্নবর্গের মানুষজনের সামাজিক বঞ্চনা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারী, উদ্বাস্তুদের হাহাকার—সবকিছুই তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে। 'মন্দিরা' পত্রিকায় প্রকাশিত একাঙ্ক নাটক বাদ দিলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশায়' প্রকাশিত 'প্রমীলার বিয়ে' সম্ভবত প্রথম গল্প। সেই সময় 'দেশ' পত্রিকা ছাড়া 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'বসুমতী' প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রপত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকগণ প্রবল প্রতাপে সাহিত্যচর্চা করতেন। অমিয়ভূষণ কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হননি। তখন লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন শুরু না হলেও 'পূর্বাশা' 'চতুরঙ্গ' 'নতুন সাহিত্য' 'ক্রান্তি' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণ বাণিজ্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত ছিলেন না। অমিয়ভূষণও সাহিত্যচর্চাকে শুধুমাত্র অর্থোপার্জনের উৎস বা নাম কেনার উপায় বলে মনে করতেন না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে যান এবং 'ক্রান্তি' 'গণবার্তা' প্রভৃতি সংস্কৃতি-মনস্ক কাগজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

লেখালিখি সম্পর্কে অমিয়ভূষণের বক্তব্য 'কবিতীর্থ' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে (১৯৮৬ সালের পূজোসংখ্যা) সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর

মতে — লেখায় *fundamental* বা *aimwork* থাকলে তা ইনটেলেক্টে নাড়া দেবেই। *'Boy meets a girl'* নিয়ে গল্প লেখার কোনো অর্থ হয় না। জনসাধারণের অতৃপ্ত চাহিদার ইচ্ছাপূরণের ব্যবস্থা করা লেখকের কাজ নয়। *Aesthetic delight* এবং *wishfulfilment* এক ব্যাপার নয়। বুঝতে কষ্ট হয় না তিনি লেখাকে ব্যবসা হিসেবে নেননি। ঐ একই সাক্ষাৎকারে 'কেন লিখি'? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন: "আমার মনে হয় সাহিত্য রচনাই আমার জীবনের 'কেন'। আমি খাই, ঘুমাই, অর্থোপার্জন করি— নানা বিষয়ের *information* মস্তিষ্কে জমা করি। সে সব কার কাজে লাগবে, সে কে, তার নিজের কাজ কি? এই প্রশ্নের উত্তর—সে কবি। এই কবির জন্যেই আমার দেহমনের কর্মব্যস্ততা। যতক্ষণ না সে লিখতে বসছে ততক্ষণ আমাকে সে খাটিয়ে মারছে, বেতর হুকুম করছে। আমি যদি আবার জন্মাই তবে ঐ কবি আবার আমার আঙুলগুলোকে কলম ধরাবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।" এই কবিপ্রাণতাই অমিয়ভূষণের সমগ্র রচনাকর্মে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

অমিয়ভূষণ কোনদিনই জনপ্রিয় লেখক নন এবং হতেও চাননি। একথা অত্যুক্তি নয় যে বাংলা ভাষা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান পাঠকের কাছেও তিনি অপরিচিত থেকে যান। অথচ এই একান্ত প্রচারবিমুখ ব্যক্তিটির 'রাজনগর' উপন্যাস ১৯৮৬তে একাধারে ভূষিত হয়েছে একাডেমি ও বঙ্কিম পুরস্কারে। অমিয়ভূষণের সাহিত্য কর্মের অনুপুঙ্খ আলোচনা বর্তমান স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়, উদ্দেশ্যও নয়। বরং বলা যায় এক মহৎ শিল্পীকে জানা ও বোঝার সামান্য কুণ্ঠিত চেষ্টামাত্র। প্রত্যেক লেখকেরই থাকে নিজস্ব চিন্তাভাবনার স্বতন্ত্র জগৎ। সেখান থেকেই তিনি তাকিয়ে দেখেন জীবনকে, যা বয়ে চলেছে নিরবধি। কুড়িয়ে নেন অতিতুচ্ছ বা মনিমুক্তোর মতো মহার্ঘ খণ্ডাংশগুলোকে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট থেকে। কেউ ভালবাসেন খুব কাছের নিত্যকার চেনা জানার গণ্ডির মধ্য থেকে তুলে, নিতে কেউ বা আজকের পরিচিত পরিসীমা অতিক্রম করে সংগ্রহ করেন তার কাহিনীর উপাদান। অমিয়ভূষণ শেষোক্ত শ্রেণীর। কবির দৃষ্টিভঙ্গি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির

অনন্যতাই অমিয়ভূষণের গল্পকথার অন্তর্নিহিত শক্তি। এই শক্তির পরিচয় আছে 'দুলারহিনের উপকথা' 'সাইসিয়া ক্যাসিয়া' 'অ্যাভলনের সরাই' প্রভৃতি গল্পে। 'দুলারহিনের উপকথার' ভুখন কৃষককের জমিতে মজুরের কাজ করে। সে যে দেশের সেটা "মকাই জোয়ারের দেশ। বৃত্তের পরিধির মত পাহাড় আর শাল মহুয়ার বন। সেই পাহাড় আর অরণ্য যদি পায়ে হেঁটে পার হও, সভ্যতার প্রান্তগুলি চোখে পড়তে পারে।" বাবা মা মারা যাবার পর সংসারে সৎমায়ের মেয়ে দুলারহিন ছাড়া তার আর কেউ নেই। বয়েসে সে চার বছরের বড়। অনেক পরিশ্রম করে তাদের সংসার চলে। ভুখন বিয়ে করার জন্যে পয়সা জমায় কিন্তু দুলারহিনের চিকিৎসায় সব খরচ হয়ে যায়। সুস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়ে দুলরাহিন ভুখনের বিয়ের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে। অসংযমী হতে পারত কিন্তু সে পথে যে যায় নি। পথে বেরিয়ে "কাঁদতে কাঁদতে মনে হল যে দিন বাপ-মা চলে যায় সেদিনও এমনি কেঁদেছিল সে কিন্তু তখন শক্ত পৃথিবীর বদলে বুকের কাছে সে দৃঢ়তা অনুভব করেছিল সেটা প্রায় শিশু ভুখনের ধূলিমলিন মুখখানা। নিঃশেষে শূন্য বুকে বোধহয় বেশীক্ষণ কান্নাও যায় না। সেই ভুখনের মঙ্গলের জন্যই আজ সে পথে বেরিয়েছে।" কি অসাধারণ আত্মত্যাগ! বাংলা গল্পসাহিত্যে এ এক উজ্জ্বল সংযোজন।

অমিয়ভূষণের প্রায় সব উপন্যাসই সমস্যা-নির্ভর। 'রাজনগর' থেকে 'বিনদনি' পর্যন্ত সর্বত্র কাহিনীর ধারাবাহিকতা সমানভাবে রক্ষিত না হলেও চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা মূল সমস্যার ওপর আলোকপাত করে পাঠককে ভাবনা-চিন্তার খোরাক যোগায়। 'নীলভুঁইয়া', 'রাজনগর', 'বিনদনি' প্রভৃতি উপন্যাস বিদগ্ধ সমালোচক মহলে একসময়ে বিরাট আলোড়ন তোলে। প্রচলিত প্রথায় তিনি একখানিও উপন্যাস রচনা করেননি। কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্রচিত্রন, পরিবেশ রচনা এমন কি সংলাপ গ্রন্থনাও সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব ভংগিতে। অমিয়ভূষণ যেহেতু উত্তরবাংলার মানুষ—সেখানকার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাত্রা, ভাষা, সংস্কৃতি তাঁর কথাসাহিত্যের অনেকটা জমি দখল করে আছে। অমিয়ভূষণ তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি' 'মহিষকুড়ার উপকথা'

'বিনদনি' এই তিনটি উপন্যাস নির্মাণ করেছেন এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবন-চর্যা', লোকাচার ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু সমস্যা নিয়ে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে তাঁর রচনাকর্মে আঞ্চলিকতার সন্ধান করা চলে না।

যে কোনো লৌকিক সংস্কৃতির প্রতি লেখকের আন্তরিক আগ্রহ কাহিনীর বিষয় নির্বাচনে তাঁকে সাহায্য করেছে। এই বিশেষ প্রবণতার সঙ্গে ইতিহাস-চেতনা সম্পৃক্ত করে অমিয়বাবু তাঁর অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ছোটগল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন: "ছোটগল্প এমন এক বৃত্ত যার কেন্দ্র আছে সর্বত্র, পরিধি নেই কোথাও"। ছোটগল্প আকারে ছোট হবে, তার গল্প ক্রমশ প্রগাঢ় হবে, একটি চমকিত পরিশেষ থাকবে—এসব প্রচলিত সংজ্ঞায় অমিয়ভূষণের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। জমাটবাঁধা গল্পরস আস্বাদ করার জন্যে অমিয়ভূষণ পড়লে পাঠক নিশ্চিত নিরাশ হবেন। অমিয়ভূষণের গল্প পড়তে যে মানসিক ধৈর্য ও শ্রমের প্রয়োজন তা সহজলভ্য নয়। মনে হয় তিনি গল্প লিখতে বসেন নির্দিষ্ট কোন প্লট মাথায় না রেখেই। গল্পের চরিত্রগুলি কথা বলতে বলতে কাজ করতে করতে গল্প তৈরী করে। —'এপস্ অ্যাণ্ড পিকক্' গল্পে সৌম্য আর শমিতা বেড়াতে গিয়েছে দেও-গিরিতে। কোনো এক নির্জনতম অবসরে সৌম্য বলে: "স্বয়ং রবিঠাকুর খেদ করে বলেছেন কাছাকাছি এক ভদ্রগোছের ভালুকও ছিল না। বর্তমান জীবন এমন ঘটনাহীন যে তাকে ঘোলা জলের ডোবা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।" শমিতা মনে মনে বলে "আ সৌম্য, তুমি হয়তো কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজছো। কিন্তু নাটক নভেলে ঘটনার কারণ খুঁজতে হয়, কোনো ঘটনাকে হঠাৎ আনলে পাঠক সেটা মেনে নেয় না, আর সব চাইতে ভালো হয় যদি ঘটনার বীজ চরিত্রে নিহিত থাকে।" অমিয়বাবুর গল্পের ঘটনাও কার্যকারণ সূত্রের নিয়ম মেনে চলে না বরং তার বীজ চরিত্রের মধ্যে নিহিত থাকে। শ্রীলতা, গিয়াৎসো, পেমা, দীপিতা, দুলারহিন এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের গল্পের মর্মমূলে প্রবেশ করতে বাধ্য করেন আর লেখক থাকেন অন্তরালে। গল্পের পাত্রপাত্রীরা তাদের জীবনদর্শন দিয়ে গল্পের জাল বুনে পরিণতির দিকে

এগিয়ে নিয়ে যায়। এখানেও লেখক থাকেন নেপথ্যে। ফলে লেখকের অধিকাংশ গল্পেরই পরিসরই খুব দীর্ঘ হয়। অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প 'সাইসিয়া-ক্যাসিয়ার' পৃষ্ঠাসংখ্যা চুয়াল্লিশ—যেগুলোকে ফেনিয়ে আজকের অর্থ-মনস্ক লেখকগণ অনায়াসে একটা উপন্যাস রচনা করতে পারেন।

ষাটের দশক থেকে ছোটগল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বড় কম হয়নি। কিন্তু অমিয়ভূষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নাম করে 'গল্পহীন গল্প' নামে বিশেষ কোনো স্টিকার লাগিয়ে কখনই কোনো রচনা প্রকাশ করেননি। উপরন্তু কাহিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠায় অমিয়ভূষণ দক্ষ মেধাবী শিল্পী। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' 'সাদা মাকড়সা' 'সাইসিয়া ক্যাসিয়া' তার প্রমাণ। পরিবেশ রচনাতেও লেখকের সানুরাগ মনোযোগ প্রশংসার দাবি রাখে। দীপিতার নিজস্ব জগৎ, মধুছন্দার গৃহস্থালী, ম্যাগদালেনের চা-বাগানের স্বপ্নময় পৃথিবী—এমনকি সুদূর তিব্বতের এক বলিষ্ঠ নারী পেমার বাসস্থান সবকিছুই অমিয়ভূষণের নিপুণ পরিচর্যায় আবিষ্ট করে রাখে। অমিয়বাবুর গল্পকাহিনীর মানুষজনের গরিষ্ঠ অংশই লোকায়ত জীবনের নিম্নবিত্তরা। কিন্তু তিনি তাঁদের নিত্য-জীবনের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে ভালবাসেন না। উচ্চবিত্তদের নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখলেও মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনীহ। প্রকৃত-পক্ষে জীবনের অনুপুঙ্খ বাস্তবতার প্রতিচিত্রণ অমিয়ভূষণের অন্বীক্ষা নয়, গল্পকে ছাড়িয়ে নান্দনিক পরিতোষ সৃষ্টিই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের মর্মবস্তু।

অমিয়ভূষণ প্রসঙ্গে তাঁর অসাধারণ গদ্যের কথা অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। গদ্যকে বাংলা কথাসাহিত্যে উনিশশতক থেকে আজ পর্যন্ত নানারূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সাহিত্যে ভাষার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে গিয়ে কখনও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ রচনা, কখনও বাংলার সঙ্গে আরবি-ফারসীর মিশ্রণ, কখনও বা সাধুচলিতের সহাবস্থান ঘটেছে। ভাষা নিয়ে অমিয়ভূষণের পরীক্ষা তাঁর নিজস্ব। গদ্য রচনায় সাবলীলতা, স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি এবং প্রসাদগুণই সমাদর পায়। শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস, পদসমূহের অন্বয়, চিহ্নের ব্যবহার ব্যাকরণের ধরাবাঁধা পথে শাস্ত্রসম্মত হয়ে না এলেও রসোত্তীর্ণ হতে পারে, যদি তা চেতনার তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী পাঠকের মন ছুঁতে

পারে। অমিয়ভূষণ যখন গদ্যে লেখেন : "রাত্রির প্রভাব, আদিম সূর্যোদয়ের চাইতেও প্রাচীন তমিস্রার রক্তে সঞ্চরিত স্মৃতি", তখন এই বাক্‌প্রতিমাকে কবিতার সমীকরণ বলে ভ্রম হয়। বা—"বল লুফতে লুফতে যদি হঠাৎ সেটা কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে কুয়োর চারিদিক ঘুরে ঘুরে কুয়োর অন্ধকার মনে নিয়ে কেমন ফিরে যায় খেলুড়েরা—তেমনি মন নিয়ে ফিরে চললো ভুখন আর দুলারহিন্", — এই গদ্যের আশ্চর্য উপমা পড়ে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

অমিয়ভূষণের সৃজনশীলতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা ফুরোয় না। কিন্তু লিপিকুণ্ঠ প্রচারবিমুখ লেখকের পক্ষে তার সবটা পূরণ করা কখনই সম্ভব নয়। তবু যৌনতাসর্বস্ব সস্তা লেখালেখির কোলাহলের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এই ব্যক্তিত্ব যখন উত্তরকালের লেখকদের জানিয়ে দেন "নিজের সংস্কৃতি থেকে যে বিচ্ছিন্ন সে এমন শিকড়ছাড়া যে তার দ্বারা আর যাইহোক সাহিত্য সৃষ্টি হয় না", তখন আমাদের মন আশার আলোয় ভরে ওঠে।

সাহিত্য দর্পণ

সাহিত্য দর্পণ সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশ্বাসী।
বিতর্কের ঝড় তুলবে এমন মৌলিক রচনা প্রকাশে আমরা সব
সময়ে আগ্রহী।

সাহিত্য দর্পণ তারুণ্যের প্রতীক।
নতুন সাহিত্য-প্রেমীদের লেখা প্রকাশে আমরা উৎসাহী।
সাহিত্য দর্পণ সম্বন্ধে যে কোনরকম সমালোচনা সাদরে গ্রহণীয়।

কার্যালয় :
সাহিত্য দর্পণ

সম্পাদক : **তরুণ রায় চৌধুরী**
৩-এ, রজনী ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা—২৬

অসুখ / অমিতাভ দাশগুপ্ত

তিনফালি তরমুজ
জানালার গরাদ টপকে পড়েছে টেবিলে।
আর একটু পরে সন্ধ্যা হবে।
রোগা ডালপালাগুলো
হাত নেড়ে ডেকে আনে পাখি ও বেড়াল।
এ সময়ে মানুষের অল্প-অল্প জ্বর আসে
না-লেখা কবিতা করে ভর।
আমিও সিরিঞ্জ ভরে দোয়াতের রক্ত নিয়ে
ফ্যাকাশে কাগজে বিঁধি ছুঁচ,
আহ্ ছাড়ুন—এই বলে
বেড়ালের ছায়াভরা ঘরে
পাখির শরীরে কাঁপে কবিতার কঠিন অসুখ।

স্মৃতি-বিস্মৃতি / সুজিত সরকার

ফেলে আসা দিনগুলি—
প্রতিদিন কিছু ভুলি।

অচেনা আঁচল
বাতাসে শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

ট্রেন থেকে নেমে আসি
সঠিক ষ্টেশনে।

প্রতিদিন কিছু মনে প'ড়ে যায়।

আক্রান্ত / বিশ্বনাথ গরাই

ও কার নিবিষ্ট ছবি গাঁথা আছে জানালার ফ্রেমে!

যন্ত্রণার ম্লান গাড়ি থেমেছে এখানে—
বাতাস বলেছে কানে কানে :
এখানে মৃত্যু তোর, সম্মোহিত দুরারোগ্য প্রেমে!

দু'চোখ নির্ঘুম, অন্ধ, পালিয়ে এসেছি
স্পর্শের অতীত দূরে, এই মুখ অসামান্য সৌন্দর্যপ্রণেতা—
আমি সেই ভয়ংকর নীল নির্জনতা
ঘ্রাণ নিয়ে নত হয়ে ধুলোয় মিশেছি।

তোমার নিথর জলে ঢেউ ওঠে নীল—
ভেসেছি আকুল, তবু চোখ জুড়ে ফুটে আছে অধরের তিল!

কাকাতুয়া / প্রমোদ বসু

আমাদের প্রত্যেকেরই ঘুম আছে, কিন্তু কোনো বিশ্রাম নেই।

প্রকৃত ঘুমের ভিতর চলে যেতে যেতে আমরা বুঝতে পেরেছি
ঘুম মানে কেবলই না-জেগে থাকা।

এতোলবেতোল পথ ধরে, খানাখন্দ বাঁক ও ভয়াবহ জ্যাম পেরিয়ে
আমরা হেঁটে যাই একটা সময় থেকে অন্য এক সময়ের দিকে ;
স্রেফ একটু নিয়ম পালন, অন্য কিছু নয়।

ঘুমের মধ্যেই অফিসের বড়বাবু ডেকে ধমকান, তস্য চাকরও ধমকায়।
স্ত্রী গঞ্জনা দেয়, পাড়ার ছেলেরা এসে চাঁদা চায়।
ভিখিরি ভিক্ষে নিতে আসে, মুদিখানার মালিক তোতলানো বাংলায়
তাগাদা দেয়। বাড়িওলা বাড়ি পাল্টাতে বলে, অফিসের সুন্দরী টেনো
বসের আড়ালে বলে, 'সিনেমা যাবেন ?'

ঘুমের মধ্যেই রয়েছে রেশনের দীর্ঘ লাইন, কয়লার অভাব,
কেরোসিনওলার সঙ্গে খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি,
পকেটমারের হাতসাফাই, রাজনৈতিক ধাপ্পা এবং অতি বয়স্ক
একটি পোষা কাকাতুয়া।

জানে সকলেই, কাকাতুয়া মানেই খিস্তিখেউড়, অশ্লীল কথাবার্তা।
কাকাতুয়া মানেই মিথ্যে বকবকানির তুফান।
ঘুম ভাঙলেই আমরা সেই কাকাতুয়া হয়ে
দাঁড়ে বসি, ছোলা খাই, শেকলে ঠোঁট ঘষি আর
ক্লান্ত হয়ে অপেক্ষা করি একবার, অন্তত একবার
সত্যিকারের একটি আরামদায়ক নিরুপদ্রব ঘুমের জন্যে।

মানুষ যা ভাবে, যথার্থ উপঢৌকন দিলে, হলেও তা হতে পারে।
কিন্তু দাঁড়ে-বাঁধা কাকাতুয়ার পক্ষে এমন চেষ্টা করা কি
সাজে কোনোদিন ?

বানানো নির্জনে / গৌতম সেনগুপ্ত

ব্যস্ততার রোদ্দুর ছিঁড়ে
কী করে ঘনায় শালবনে দীর্ঘ ছায়া
বালিয়াড়ি ঘিরে
ঘন ঘন চোরা ঢেউ
পায়ের তলার মাটি অস্থির করে তোলে
এ-সবই রক্তে আছে মিশে।
তবু কোনো-এক-টুক্‌রো চাহনি
রক্তের গভীরে খেলা করে
কিছু কি বলেছিলে কিছু কি বলেছিলে.....

চলার অভ্যাসে পা
ভুল করতেও ভুলে গেছে
চেনা গানে চেনা শব্দগুলো
যেন-বা মরণ ঘুম ঘুমিয়েছে
বর্ণহীন ভীড়ে নামহীন ক্লান্তিদের
অনিবার্য সখ্য নামে
মনজুড়ে বৈশাখী দহন ; তবু চাহনিতে
রিমঝিম্ বেজে ওঠে
অনর্গল স্নিগ্ধ জলধারা—
বানানো নির্জন ঘিরে প্রশ্ন বাজে
কিছু কি বলেছিলে কিছু কি বলেছিলে.....

ছিপ / সুভাষ মজুমদার

ছিপ ফেলে বসে আছি ;
সময় গড়িয়ে যায়, তারপর একদিন
কে যেন আমাকে এসে বলে—
এই তুই উঠে চলে আয়।

কোথায় উঠবো আমি ?
এই ব্যূহ ভেদ করে
এবার কোথায় যেতে হবে ?

তাল-তমালের ছায়া ক্রমশ গভীর হয়ে আসে
আর দেখি চোখের সামনে দিয়ে
এক একটি দিন দূরে চলে যায়।

ছিপ রেখে এবার কোথায় যেতে হবে !

দৃশ্যপট / বিবস্বান ভট্টাচার্য্য

বিশালতায় অভেদ্য আকাশের
চারপাশ ঘিরে ব্যাকুলতা,
ক্ষুদ্র হাঁওয়ার জটলা
আর পালতোলা নৌকার মত
মেঘের ভেসে চলার মাঝে
ঘুম আসে ঘুম যায়,
দারিদ্র্য চালচিত্র আঁকে :
শরীরে—কোষে—রন্ধ্রে।
মাটির পৃথিবী
চুপচাপ থাকে,
চেয়ে চেয়ে দেখে—
আমরা কেমন আছি
আকাশের বিস্তীর্ণ ছাউনির নীচে।

চন্দ্রাভিযানের বিরুদ্ধে / অমিত মৈত্র

অধুনা বিলুপ্ত কোন ঘন ম্লান দ্বীপপুঞ্জে
আমি প্রতিবেশী—

মাকে কবে হারিয়েছি মনে নেই
এলানো সুকেশী
কেউ শুয়েছিলো নাকো
দেখা গেছে বহুবার চাঁদ চুঁড়ে চুঁড়ে

মাকে যদি ফিরে পাই
আমি ফিরে চলে যাই মায়ের আঁতুড়ে।

মেঘলা দিনের গল্প / মলয় দে

গল্প বলা হলো না ;
ভালোবাসলে চাইতে নেই—
গল্প একটা ছিল—যার জন্য, বলা হলো না।

কিছু একটা পাবার আশায় বোধহয়
লিখেও ফেলতে চেয়েছিলাম।

ছাপাটাপার প্রশ্নই আসে না,
একান্ত ব্যক্তিগত গল্প ;
তবে, ছাপা রেখে যাবার ইচ্ছে ছিল,
ইচ্ছে ছিল—
ছায়ার মতো থেকে যাব ;
সূর্য উঠলেই, নিত্যসাথী হবে ছায়া।

অনেক বেলা হল বুঝতে ;
গল্পতো একটা ছিল এবং লেখবারও ইচ্ছে,
যেহেতু সব চাওয়া-পাওয়ার ওপরে—
তাই লেখা তো দূরের কথা—
বলাই হলো না গল্পটা—মেঘলা দিনের মতো।

প্রস্তর যুগ / অর্ণব রায়

মাটির পেটের কাছে জমে থাকা জন্মতিথি
বহুকাল সকাল দেখেনি,
চায়ের টেবিল ধরে উত্তেজনা জলে উঠে
নিস্তেজ শব্দমালা গড়ে।

আগুনকে থমকে দিয়ে পাথর বাঁধানো পথে
(ফুলকিরা বাহবা কুড়ায়)।
পাথর বাঁধানো ঘাটে স্নান করে ভেসে উঠে
লজ্জা পায় উলঙ্গ শরীর ;
স্রোতের আঁচলে মুড়ে তবুও ডোবে না আর
হাতে চোখ ঢেকে।

জন্মতিথি কেটে কেটে দেশলাই নেভে
মোমবাতি শেষ হয়
কেক্ কেটে ছুরি ছোটে সাইরেন দিয়ে—
সামনে চড়াই, হাওয়া ব্রেক !

আলো কমে সন্ধ্যা আসে
সন্ধ্যা হয় রাত
সাপের বুকের মত আস্কারাগুলো
ধুয়োমাখা রাতেদের বিস্তৃত করে।

জন্মদিনে / শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

সমস্ত মানচিত্রময় আজ পর্যটনের তুলো ওড়ে এদিক ওদিক। তুলো ওড়ে,
ওড়ে তুলো, তোষক বালিশ যেন ছিঁড়ে একাকার। শীতের কাণিশ
জুড়ে পোষাক বদল করে রোদ, শব্দের তোরঙ্গে মারে টান।
ভিতরে তাকাই, বুঝি
দুঃখেরও এক নিজস্ব ঐশ্বর্য আছে, প্রতিটি শব্দের মৃত্যুই
চিনিয়ে দিয়ে যায় অন্য এক নতুন শব্দকে। বাহিরে তাকাই, দেখি
অসংখ্য শব্দের প্রয়াণ ঘিরে এ আয়োজন চলে জন্মদিনের—
গড়ে ওঠে মঞ্চ, নড়বড়ে কাঠের চেয়ার, তারই নীচে হিলিবিলি আমলকী পাতা।
শব্দের গার্হস্থ্য থেকে পথভ্রান্ত জন্মান্ধের মত
ছুটে আসে হাওয়া, ধুলো যাকে মেধাবী করেছে। আজি এ জন্মদিনে,
শুভেচ্ছা জানিয়ে শুধু বাহিরে-ভিতরে হাওয়া দেয়। ক্রমাগত।
প্রাণবন্ত তারুণ্যে ঘরে চলাফেরা করে এক কবির কিশোর, কঠিন অসুখে।
স্মৃতির চৌকাঠে পড়ে পা, অকস্মাৎ, কেঁপে ওঠে গোপন আস্তিন।
বহুদূর, পাতাঝরা অরণ্য ভেঙে আজ পুরনো দুঃখরা ফিরে আসে,
তাদের শিয়রে এত নম্রনীল জল। কুমারী শবের ওষ্ঠে তারা পোড়ায়
সপ্তপদী, আমার চোখের ধুলো মুছে দেয় আঁচলের ভাগে,
তারপর এসে বসে কবিতার কাছে। দুঃখ ছাড়া আর কি
কোন দ্বিতীয় অলঙ্কার মানায় কবিতার পাতাতে ! তাদের বল্লমে ফোঁড়ে
জন্মদিনের মেঘ, কবির জন্মদিনে, কলকাতার বুক জুড়ে
শব্দহীন এ এক আশ্চর্য বৃষ্টিপাত হয় দিনভর, তোমরা তা জানতেই পারো না !

বেলা পড়ে গেলে রোদ ক্রমে ফিকে হয়ে আসে অর্ধেক কপালে। মঞ্চের ধুলো
ঘিরে প্রণিপাত করে ওঠে হাওয়া, প্রাক্তন বিষাদে ওড়ে সাদা অটোগ্রাফ।
সুচীপত্রে হাত কাঁপে, এ সমস্ত দিনে সবই ওলট পালট। নিজের ভিতরে
দেখি নিজেকে, নিশ্চুপ আলোর বৃত্তে একা। শব্দের পেরেকে বেঁধে কবির নিয়তি।
পোড়া লণ্ঠন ঘিরে বসে থাকি আমি, প্রতিটি শব্দ খোঁজে
শৈশবের ভিতরে তার দাঁড়াবার জায়গা। জন্মদিন শব্দটির কোন ঘরবারান্দা নেই,
শুধু আছে ভিতর-বাহির, আছে মিছে স্নেহপ্রদ অঘ্রাণ কামড়, আছে এক পশ্চাৎ জানালা

জানালার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় সে আসে, পরণে ছিন্নভিন্ন পাৎলুন,
পিছে ফেলে বিদ্যাপীঠ, বৃন্দাবন ঘন্টিওলা .....কবিতার খাতায় ফেরে
তার ঘণ্টার রোদন.....
যাবতীয় দৃশ্যাবলীর ভিতর থেকে ছুটে আসে সে দুরন্ত বালক, বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট,
সে এসে বসে আমার শব্দের নির্জন বারান্দায়। তারই জন্য এইসব,
রোদ, বৃষ্টি, মেঘ—সাদা পৃষ্ঠার দিকে এভাবে নির্বাক চেয়ে থাকা।

এখনও পর্যন্ত
শিবশম্ভু পালের একটিই মাত্র কাব্যগ্রন্থ
ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়
যা হয়তো কারো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকতেও পারে।
প্রকাশকাল : ১৯৬৯
প্রকাশক : সাহিত্যপত্রগ্রন্থ
৯, কাশী ঘোষ লেন, কলকাতা-৬

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
প্রবাহপথ ৭·০০ টাকা
: অন্যান্য গ্রন্থ :
সীমান্তের কাঁটাতারে (কাব্যগ্রন্থ) ২·০০ টাকা
একটি দ্বৈপায়ন সত্তা : জে, এম, সিঙ্গ
(জে, এম, সিঙ্গ-এর নাট্যাবলীর ওপর আলোচনা) ১২·০০ টাকা
: প্রাপ্তিস্থান :
প্রমা প্রকাশনী
সীমান্ত। ৬-সি রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী, কলকাতা-৯ এবং
১৭টি রাণী ব্র্যাঞ্চ রোড, কলকাতা-২

কাব্যসাহিত্য, সত্যেন্দ্রনাথ

জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকদের ভিতর দেবেন সেন প্রমুখ দু'-চার জন স্মরণীয় কবি ছিলেন। কিন্তু আধুনিক বাঙালী পাঠকসাধারণ এ সব কবিদের বিশেষ কোনো খোঁজ রাখেন ব'লে মনে হয় না। এমন পাঠকও আছেন—কবিতার পাঠক—উপরোক্ত অনেক কবিদের নামও যাঁদের ভালো ক'রে জানা নেই। আমাদের দেশে দীর্ঘায়িত ঐতিহ্যের অভাব নেই—সভ্যতা ও সংস্কৃতির; কিন্তু মন আমাদের কেমন নির্বেদী যেন। এটা অবিশ্যি ঠিক যে আজকের পৃথিবীর ক্রমায়ত মনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি বা জাতির বিশেষ কৃতিত্ব—এমন কি সদগুণাবলী নিয়ে আত্মস্থ হয়ে থাকলে অশোভন আত্মউপাসনায় জাতির জীবন আচ্ছন্ন হয়ে পড়বার বিশেষ আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এর পরিণাম ভালো নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় সব জিনিষই ভালো, অভারতীয় প্রায় জিনিষই অগ্রাহ্য, বাঙালীর শিল্প-সাহিত্যও বাংলার মাটির নিকটতম আত্মজ হ'লেই সবচেয়ে ভালো, তা ততটা না হয়ে সে সাহিত্য ও শিল্প যদি বরং একটু বৃহত্তর পরিবেশ-ঘেঁষা হয় তাহ'লে তা অবদান হিসেবে সন্দেহজনক, এরকম মনোভাব আমাদের দেশে সেকালেও দেখা গিয়েছিল, আজকেও নব্যভারত ও নব্য-বাংলার শক্তিসংস্কৃতির পুনরুন্মেষে বা তার প্রয়োজন বোধ ক'রে কোনো কোনো কর্ণধারদের ভিতর দেখা যাচ্ছে। এ মনোভাব কতদূর সার্থক এ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা চলে। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ নেই আজকের এ প্রবন্ধে। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে একজন সৎ বাঙালী বা অবাঙালী সাহিত্যিককে যথাক্রমে বাংলার বা তার বাইরের মৃত্তিকার প্রতিভা স্বাভাবিক-ভাবে ধারণ ক'রেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু এই প্রতিভাকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তাকে অনুভব করতে হয় যে সে বাঙালী বা অবাঙালী লেখক ঠিক নয়—সে আজ, কাল, ও ভবিষ্যসন্ধানী সার্বভৌম

সাহিত্যিক। এখানে মানুষ জাতির ও ভূগোলের নানা রকম বাঁটোয়ারা বিভাগের প্রশ্ন নিষ্ফল হয়ে প'ড়ে থাকে; কবি বা সাহিত্যিক দেশ সময়ের অন্তহীন বিমুক্তির ভিতর নিজেকে ভালো ক'রে, ঠিক করে বুঝে নেবার অবসর পায়।

আধুনিক বাঙালী পাঠক তার পূর্বজ মৃত সাহিত্যিকদের—বাংলার সে সব উজ্জ্বল কবিদের সাহিত্য পাঠ ক'রে আনন্দ ও উপকার এবং বাংলার মৃত্তিকার চমৎকার প্রসাদ লাভ করবার কোনো আন্তরিক আগ্রহ আজ আর পোষণ করেন না। এ সব পাঠক কবি বিহারীলাল, দেবেন সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয় বড়াল—সকলকেই তো প্রায় ভুলে বসে আছেন। অথচ এঁরাই আধুনিক বাংলার কোন্ কবি বা সাহিত্যিক কত দূর বাঙালী ব'লে স্মরণীয় এবং বিদেশী ব'লে বর্জনীয় এ বিতর্কের আসরে নেমে সৎ সাহিত্যিককেও ইউরোপীয় মনের উচ্ছিষ্ট সন্তান ব'লে প্রচার ক'রে বাংলার তথাকথিত সারস্বত সমাজমনের পরিচয় দেওয়া হ'ল মনে করেন।

এই সবই যদি হ'ল তাহ'লে বাংলার মৃত্তিকার মানে রইল কী? বাংলার সেকালের ভালো কবিদের ভালো ক'রে চিনি না, সৌন্দর্যসেবী সত্যার্থী মনে কোনো সাড়া জাগে না, কিন্তু আধুনিক অত্যাধুনিক কালের অমুক সাহিত্যিকদের অক্লান্ত ব্যঙ্গের মর্যাদা দান করতে পারি তাদের সাহিত্যে বাংলার মাটিকেই প্রথম ও প্রধান প্রসবিনী হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি ব'লে। এরকম অর্ধশিক্ষা নিয়ে সাহিত্যবিচার চলে না, মনের সততা ও সঙ্গতিবোধ এতে অকালেই নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক বাংলার কবিতা-পাঠকদের মধ্যে অন্তত, চেতনায় বা অবচেতনায় দৃষ্টিরীতির এ রকম শিথিলতা—হয়তো বৈকল্য, প্রচুরভাবে দেখা দিয়েছে। এলিয়ট-পড়া দুর্ভাগা কয়েকজন আধুনিক বাঙালী কবি যে এলিয়টও নন, বিদেশীও নন, আমাদেরি এ-কালের কবি, একথা কয়েকজন উল্লেখযোগ্য আধুনিক সমালোচককে কে বোঝাবে?

বস্তুবিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের ভিতর শুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে প্রবেশের আয়োজন রয়েছে যেমন কবির তেমনি প্রয়োজন রয়েছে দেশকাল-নিরপেক্ষ সাহিত্যের মর্মগ্রাহী হবার। তাই দান্তে সেক্স্‌পীয়র—এমন কি এলিয়টকেও পড়ে বাঙালী সাহিত্যিকও। এতে সাহিত্যিকের দৃষ্টিবলয় প্রসার লাভ করে—অপর

কবিদের সাহিত্যসত্ত্ব চুরি ক'রে নয়— অধিগত ক'রে; সমস্ত মহৎ কবিই শুধু বহির্জগতের নয়—সাহিত্যলোকেরও নানা রকম শ্রেষ্ঠ অবদানগুলোকে আয়ত্ত ও নিজের আত্মার আজ্ঞাধীন করবার মত প্রতিভা নিয়ে আপন আপন শিল্পলোক সৃষ্টি করেন।

এ সব তো সোজা কথা; জানা কথা। যাঁরা জানেন না, আভাস দেন, তাঁরাও জানেন এ সব। না জানার ভান ক'রে তাঁদের বা অপরের কোনো প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ হয় না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও আমরা আজ আর স্মরণ করি না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ এলিয়ট পড়েন নি, বাংলাদেশে বাংলার পটভূমি ও মৃত্তিকার সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল অনেকটা। সত্যেন্দ্রনাথ মহাকবি ছিলেন না অবিশ্যি। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে কবি হিসেবে মহৎ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না হয়তো। কোনো দেশের একান্ত দেশজ কবি তাঁর নিজের ভিতরকার স্বভাবকবিকে শিক্ষিত, সংস্কৃত ও মার্জিত করার প্রয়োজনে নিজের ক্ষুদ্র বা নাতিক্ষুদ্র কল্পিত রাজ্যের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন না। এ ধরণের কবিরা নিজেদের সীমিত—হয়তো অতিসীমিত অভিযানের দেশে তবুও আত্মস্থ। আজকের এই কঠিন বিরাট বিপর্যস্ত যুগে এ জাতের সাহিত্যিক বিরল। কোনো যুগে কোনো দেশেই শ্রেষ্ঠ কবিরা দেশের প্রতিভারই আধার নন;—অনেক দেশ, বিভিন্ন সময়চারণার আশ্চর্য সঙ্গমসমন্বয় তাঁদের কবিমানসে। কিন্তু তবুও একজন কবি বড় কি ছোট তাঁর দেশজ বা দেশোত্তর মানসপরিপ্রেক্ষিতের ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। কেবলমাত্র নিজের দেশের ঐতিহ্য উৎসারিত করে কবি বড় হ'তে পারে, অন্য দেশ ও সময়ান্তরকে ভালো ক'রে উপলব্ধি না ক'রেও। কিন্তু তা করবার সুযোগ, শক্তি থাকলে আরো বড় কবি হ'ত সে। অবশেষে সময় ও দেশের নিহিত অভিজ্ঞানগুলোকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝে নিয়েও মানুষ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হতে পারে, মহৎ কবি নাও হতে পারে। কিন্তু এ জন্যে কবি ও ঐতিহাসিকের ভাবনা-চেতনার তারতম্যই দায়ী, গভীরতর উপলব্ধির কোনো দোষ নেই, ক্ষীণ উপলব্ধির কোনো গুণ নেই। কবির পক্ষে— বিশেষত আজকের

যুগে—তাঁর নিজের দেশের চেয়ে বিপরীতধর্মী বিশিষ্ট দেশের কালচার—এমন কি ভাষা আয়ত্ত করলে নিজের দেশজ সত্তাকেও প্রবীণ ও পরিচ্ছন্নতর ভাবে অনুধ্যান করবার ক্ষমতা জন্মাবে তার—নিজের কবিমানসের পরিণতির পথও প্রশস্ত হতে থাকবে।

আমাদের দেশে বড় দেশোত্তরী সময়তীর্ণ কবি তো রবীন্দ্রনাথ। বাংলা দেশের বড় দেশজ কবি কে? অত বড় সার্বভৌম কবি ব'লে রবীন্দ্রনাথের দেশজ দিকটা কি ক্ষুণ্ণ? রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা প'ড়েই মনে হয় যে তাঁর পক্ষে গোবিন্দচন্দ্র বা মিস্ত্রালের মত অত সরল ও গ্রামীন হওয়া সম্ভব নয় ব'লেই তাঁর কবিতায় সে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস নেই। রবীন্দ্রপাঠকদের ভিতরেও গ্রামীন সহজ মন কোথায়? সরল চিত্ত অনবদ্য কৃষিজগতের জিনিষ। সে জগৎ কোথায় আজ? বিশুদ্ধ চিত্ত উন্নত পৃথিবীর কাম্য। সে পৃথিবীই বা আজ কোথায়? অনবচ্ছিন্ন অভাব ও ভাববিমিশ্র তাড়না নিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখছি আজ, কাজ করছি, সাহিত্য পাঠ করছি। গ্রামীণ সারল্যের চাহিদা নেই জীবনে বা সাহিত্যে। কি ক'রে কাব্যে তাকে পাব? সেকালের গ্রামসরলতা নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়, নবযুগের নতুন সারল্য ও সহজ নবীন লোককবি আসে নি এখনো।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাদেশের সহজ আত্মজ কবি হতে পারতেন কিনা তাঁর কাব্য পড়লেই এ প্রশ্ন চুকে যায়। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে সে রকম কবি তিনি হতে পারেন নি। তাঁর চর্চাপ্রিয় উৎসুক মন অনেক দেশ ও সময়ের প্রবাহে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে সব দেশের কবিতার অনুবাদ তিনি গ্রথিত ক'রে গেছেন তাঁর নানা বইয়ে। এসব কবিতা পড়তে পড়তে যে আবহের সৃষ্টি হয় পাঠকের সঞ্চরণশীল অনুভূতিতে, —কোনো সাধারণ মানুষ বা অসাধারণ সার্থবাহও নানা দেশে ঘুরে সে চিত্তহারী আস্বাদ না-ও পেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য দিকের সার্থকতা এইখানে।

কিন্তু তবুও শিপ্রানদীর পার বা হংসবলাকা কিংবা জীবনের পঞ্চাশ বছর ধ'রে রূপনারাণের কূলে জাগরণকে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র অনুবাদতৎপর কিংবা

প্রায় তদনুরূপ মননশক্তির প্রয়োগে নয়, ভাবনাপ্রতিভার সে এক স্বতন্ত্র দিব্যতায় আজকের সময়পরিধির ভিতর নিয়ে এসেছেন, চিরসময়ের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর একজন প্রাচীন ইউরোপীয় কবির দিকনির্ণয়ী মন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সূর্যনক্ষত্রের স্বর্ণপাখি-ও-নীলিমার যে বৈজন্তীয়মে চলে গেছে সে দেশ অপরূপ। সত্যেন্দ্রনাথের সংকল্পের, স্বপ্নের পৃথিবী এ সবের চেয়ে ঢের সীমিত। কিন্তু তাহ'লেও অনূদিত ও স্বরচিত কবিতায় কোথাও কোথাও আবেগপ্রধান বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বাংলার ছন্দের ঐতিহ্যকে পরিচ্ছন্ন ও প্রবহমান ক'রে সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আবেগ যদি আরো মহৎ ও গভীর হ'ত, বুদ্ধি যদি উঠে যেত বোধির, vision-এর পর্যায়ে, তাহ'লে ছন্দের দিকে অতটা উচ্ছ্বসিত নজর দেবার প্রয়োজন হ'ত না হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের।*

*কবির অগ্রন্থিত এই রচনাটি অধুনালুপ্ত 'অনুক্ত' সাহিত্য-পত্র ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৬২ থেকে সংগৃহীত, সম্পাদক কবি সুনীলকুমার নন্দী মহাশয়ের সৌজন্যে।

—সঃ অন্তরীপ

ধানসিড়ি

কবিতার মায়াকানন

সম্পাদনা : **দীপক কর**

১৮, বাড়মাণিকপুর, মেদিনীপুর-৭২১১০১

'গাজনের মেলা' এবং **'জীবন দেখায়'**- এর পর

ব্রত চক্রবর্তীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ

'আগুনের মাঝখানে'

প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশক : শতভিষা

সমর সেনের স্মৃতিতে নিবেদিত

পিঙ্গল প্রহার

নিখিলেশ গুহ

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত। ('রাত্রি', জীবনানন্দ দাস।)

আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল
নামুক মহুয়া-ফুলের গন্ধ। ('মহুয়ার দেশ', সমর সেন।)

একই সময়ের অন্তর্ভুক্ত দুই বিপরীতধর্মী কবিপ্রতিভার ব্যবধান সবচেয়ে স্পষ্ট যখন একজনের কাছে প্রত্যাশিত বিষয় অন্যজনের লেখনীবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মানসিক ভিন্নতার ফলে ব্যঞ্জনার প্রভেদ ঘটায়। সাধারণ অভিজ্ঞতা কবিত্ব রসে জারিত হয়ে যে বিশেষ তাৎপর্য পায় তার থেকেই আমরা বুঝি আর পাঁচজন থেকে কবি কিভাবে কেন স্বতন্ত্র, কোথায় তাঁর বৈশিষ্ট্য। যাকে আমরা প্রাতিস্বিক উচ্চারণ বলি তা-ও যে সময়ের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত নয় উদ্ধৃতি দুটি সেই পরিচয়ও বহন করে। জীবনানন্দ দাস এবং সমর সেন বাংলা কবিতায় মেরুপ্রমাণ দূরত্বে চিহ্নিত—শান্ত তৃণভূমি ও নদীস্রোতের মতো একজনের স্বভাব মৃদু, এলায়িত, সামান্যতম স্নায়ুস্পন্দনে সংবেদনশীল; অন্যজন নাগরিক সপ্রতিভতার শাণিত নিদর্শন, পরিহাসনিপুণ, বুদ্ধিনির্ভর। আলোচনারম্ভে উৎকীর্ণ পদগুলিতে কিন্তু তাঁরা তাঁদের সাধারণভাবে পরিচিত অবস্থানবিন্দুগুলির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা' এবং 'বনলতা সেন'-এর মগ্ন প্রকৃতিপ্রেমিক সময়ের দংশনে আক্রান্ত, মস্তিষ্ক সঞ্চালনে ক্লান্ত শহরবাসী প্রকৃতির বুকে ফিরে যেতে অপরদিকে সমান ব্যাকুল। সময়ের সংক্রাম এবং নিসর্গের হাতছানি আধুনিক মানুষকে কিভাবে দোলায়িত করছে উপরের ছত্রগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জীবনানন্দের সমগ্র কবিকৃতি তাঁরই একটি কবিতার শিরোনাম ধার ক'রে

বলা যায় 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য'। ঐতিহাসিক বিচারে এই কালসন্ধির প্রধান লক্ষণ সমর সেনের ভাষায়—'বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার' ('ঘরে বাইরে')। দুরারোগ্য সময়ের ব্যাধি এবং দুর্নিবার প্রকৃতির আকর্ষণ আধুনিক সভ্যতার মর্মমূলে যে বিচিত্র জটিল আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে তাতে ব্যক্তিসম্পর্কে বিচ্ছিন্নতা একদিকে যেমন অবশ্যম্ভাবী, অন্যদিকে সমস্যার সমাধান তেমন দুরূহ। আর্ত বিপন্নতা জীবনানন্দ এবং সমর সেনের কবিতায় একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শোনা যায়, যদিও উত্তরকালে আত্মবিশ্লেষণের পদ্ধতি এক থাকেনি। তুলনাস্থলে তবু স্মরণ না ক'রে পারি না

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
('বোধ', জীবনানন্দ দাস।)

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ
('মুক্তি', সমর সেন।)

গদ্য কবিতা রচনার সমস্যা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রবল আগ্রহের সময়ে সমর সেনের আবির্ভাব। সংস্কৃত আদর্শের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই নির্দেশ দিয়েছিলেন—'এই ছন্দ (গদ্যছন্দ) সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রের ওজন মেনে চলে' (সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি, ২২মে ১৯৩৫)। প্রায় একই সঙ্গে প্রকৃতির রাজ্য থেকে তুলনা টেনে তিনি বলেন—'ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য' (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পত্র, ১৭মে ১৯৩৫)। গদ্য কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কেবল প্রকরণের ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, আঙ্গিক ছাড়িয়ে বিষয় নির্বাচনের দিকে আলোচনা বইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে এমন একটি আভিজাত্যের বাঁধ ছিল যা প্রসঙ্গের বাছ-বিচার না ক'রে পারে নি। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিকতা তখন সর্ববিধ সংস্কারের বিপক্ষে। 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে বাস্তবের শ্রেণী-নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে মত ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানান 'নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে

এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব। আর যে-সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে যায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্য-বর্জিত হয়ে তারা আমাদের কাছে ছায়া।'

বাস্তব—এতদর্থে অবশ্যই—প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হিসাবে কবি গদ্য ছন্দের আশ্রয় নিতে চান। 'পুনশ্চ' এবং 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের আদর্শ হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে সেই মর্মেই নিজেকে প্রকাশ করেন। 'কবিতা' পত্রিকার সর্বপ্রথম সংখ্যায় কবিতার আসরে সমর সেনের আবির্ভাবে প্রশস্তিবাচন রচনা করেন—'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে।' জাপানী চিত্রের তুল্য প্রেম ও প্রকৃতির মিতায়তনিক কল্পনাবন্ধের যে নিদর্শনগুলি কবিগুরুর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছিলো, উনিশশো সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দের পর সমর সেন সেই প্রকাশপথ ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতেই যেমন বলেছি নাগরিক কবিসত্তার প্রতিভূরূপে বিবেচিত হলেও নিসর্গের প্রতি আকর্ষণ ফল্গুধারায় তাঁর রচনার অনেকখানি জুড়ে আছে। আলোচনার গোড়ায় জীবনানন্দের সঙ্গে যে তুলনাটির প্রবর্তনা করেছিলাম তার দিকেও তাকানো যেতে পারে। সভ্যতার বিবর্তনে আমরা যে-স্তরে উঠে এসেছি তাতে গ্রামজীবন যেমন বিপর্যস্ত, শহুরে সমাজ সম্পর্কে তেমন জটিলতাবৃদ্ধি। জীবনানন্দ এবং বিভূতিভূষণ সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিমগ্নতার শেষ নিদর্শন। গ্রামীণ কেন্দ্রচ্যুতির বেদনা জীবনানন্দে প্রত্যক্ষ আকার লাভ করেছে, শহরে মাৎস্যন্যায়ের উপস্থিতি বোঝাতে তাই তাঁর কবিতায় অন্ধকার মহাদেশের উল্লেখ। সমর সেনের নিসর্গ চিত্র পক্ষান্তরে ইঁট কাঠের ইমারতে বন্দী মানুষের স্বপ্নচারিতা, প্রকৃতির বুক থেকে উত্থিত আনন্দবিলাপধ্বনি নয়ঃ

কিছুদূর দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য
কুয়াসায় ঝাপ্‌সা পাহাড়
লাল পথে কালো সাঁওতাল মেয়ে।
('বকধার্মিক')

মাঝে মাঝে, সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত লোহার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর বেদনায়।
('মহুয়ার দেশ')

মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে ধূসর পথ
দূরে সূর্য অস্ত গেল
ভরা চাঁদ এলো নদীর উপরে,
চারিদিকে অন্ধকার—রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোন দ্বীপ থেকে
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধূসর-সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—
('নাগরিক')

ধাবমান কাল
ট্রেনের লোহরেখার উপরে আজো
আনে লোহিত-হলুদ চাঁদ
সন্ধ্যার দিকে তপ্ত আবেগে
স্নিগ্ধ মেঘে আকাশ শান্ত গম্ভীর।
('কয়েকটি দিন')

সমর সেনকে নিঃশর্তে নাগরিক কবি বলা চলে কিনা সে-বিষয়েও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। শত দৈন্য-গ্লানি সত্ত্বেও যে বিরাট রঙ্গমঞ্চে অগণিত জনসাধারণের জীবননাট্য প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তার কোথাও কখনো কি মায়ার স্পর্শ লাগে না? অন্তত কলকাতা শহরের আবাহন বাংলা কবিতায় কত ভাবেই না ঘটেছে! কিন্তু সমর সেনের কবিতায় 'দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক', আসন্ন সন্ধ্যায় 'মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ / দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়' প্রভৃতি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পংক্তির সন্ধান পাওয়া গেলেও শহরে বেঁচে থাকার অর্থ কেবল একই বিবর্ণ বৃত্ত পরিক্রমা,—আবর্তন, পুনরাবর্তন।

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন,
তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
... ...
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ
... ...
... ...
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন। ('নাগরিক')

কলতলায় ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক-সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।
('একটি বেকার প্রেমিক')

অবশেষে শূন্যের সরাইখানায়
ভ্রাম্যমাণ বিলোল দিন অদৃশ্য হয়,
পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ,
কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি।
('বকধার্মিক')

রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে;
তারপর আকাশ ভারি হয়ে ওঠে,
বিরস কাজের সুরে
কতোদিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশী বাজে
('For Thine is the Kingdom')

সন্ধ্যার সময়,
রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি—
চারিদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।
('নাগরিক')

এতখানি হতাশাগ্রস্ত সমাজচিত্র ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় কমই দেখা গেছে। চল্লিশের দশকের দৃপ্ত গণসংগ্রামে যিনি দায়বদ্ধ, এদেশের সাম্যবাদী সাহিত্যের প্রথম যুগের রূপকারদের অন্যতম, যাঁর পংক্তিবিন্যাসে ধ্বনিত কৃষক কণ্ঠের শ্লোগান—'মালগুজারী কৈসে লেওগে, ঝাণ্ডা মেরি জিন্দাবাদ'—সমাজের মূল নির্ভর শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে যিনি আত্মীয়তা খোঁজেন, তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্তর সংকট কি বড় বেশী স্থান নেয়? সাধারণভাবে এই প্রশ্নের যা উত্তর তা আমাদের অজানা নয়। বলা হ'য়ে থাকে বিচ্ছিন্নতা বোধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্রেই নিহিত, ইতিহাসের বিবর্তনে বুর্জোয়া শ্রেণী একদা যে নেতৃত্বে কাজ করেছিলো, বহুকাল তার উত্তরাধিকার বহনের সামর্থ্য লোপ পেয়ে দেখা দিয়েছে পলায়নী মনোবৃত্তি, সমষ্টিগত স্বার্থ বিবেচনা না রাখায় যার পরিণাম বেদনাদায়ক এবং হাস্যকর।

চোখ বেঁধে আজ ভবের খেলায় ভাসা!
তবু ত চারিধারে ধ্বংসের অদৃশ্য গ্লেসিআর। ('বকধার্মিক')

বর্তমানে মুক্ত কচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা
মাঝে-মাঝে মনে হয়,
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি। ('নিরালা')

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে সমর সেন কবিতায় নিজেকেও সুবিধাবাদীদের একজন হিসাবে বিদ্রূপ করেন—

জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।
... ...
বুঝি না তাকে,
দুধে ও তামাকে সমান আগ্রহ যার
দু-নৌকোর যাত্রী এই বাঙালী কবিকে।
বুঝি না নিজেকে। (২২ শে জুন)

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে আধুনিকতার ধ্বজাধারীদের আপত্তির বড় কারণ ছিলো, ধূলিমলিন প্রাত্যহিক অস্তিত্বের ছায়া সেখানে সামান্যই পড়েছে। সংসারের বহু তুচ্ছ, অবহেলিত দিকে দৃষ্টি ফেরাতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জগতের যে মনোভাব তাঁদের আদর্শ বোধ হয়েছিলো কবি তাকে চিনতে ভুল করেননি—'তারা পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিরা যে বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত' ('আধুনিক কাব্য')। এলিঅটের দৃষ্টান্ত এড়িয়ে যাওয়া সেকালে ইংরিজি ভাষার সঙ্গে পরিচিত কোনো কবিযশোপ্রার্থীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সমর সেন

স্বভাবতই তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে অনুরাগ এবং সাম্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস তাঁর কবিতায় কি যথার্থ সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলো? এলিঅট প্রদর্শিত পথে পৃথিবীর যাবতীয় অসঙ্গতির উদ্দেশ্যে বাক্যনিক্ষেপ, আত্মনিগ্রহ এবং গদ্য-পদ্যের সমীকরণ মারফৎ তাঁর কাব্যদেহ অনেকখানি গড়ে উঠেছিলো। বুর্জোয়া জগতের অবক্ষয়ের চিত্র তাতে অবতারিত। শহরে অন্তঃসারশূন্য মুখের মিছিল—'আর কত লাল সাড়ি আর নরম বুক, আর টেরী কাটা মসৃণ মানুষ,/আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,/হে মহানগরী!' ('নাগরিক') নারীর মাধুর্য, প্রেমের মহিমা অন্তর্হিত। একশো বছর আগে ফরাসী কবি বোদলেয়ার কাম এবং কৃত্রিমতার প্রতি-মূর্তিরূপে স্ত্রীজাতিকে যে হীন চরিত্রে অঙ্কিত করেছিলেন, কঠিন জীবনধারণের টানে সমর সেনের কবিতায় নারী সেই একই ভূমিকায় বিবর্জিত—

কালো পাথরের মতো মসৃণ শরীর,
মেয়েটি চোখ মেলল বাইরের আকাশে—
সে চোখে নেই নীলের আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা
শুধু কিসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা,
কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে। ('নাগরিক')

প্রাণীজগতেও মুক্তির আস্বাদন নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় নিঃসঙ্গ দুপুরে কাকের ডাক 'সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি' ('কাক ডাকে'), কিন্তু সমর সেন শোনেন শুধু অনুর্বর বালুর উপরে 'কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান' ('রোমন্থন')। গগনবিহারী চিল গতিপথ থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়ার সময়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চোখে গ্রীক উপাখ্যানের পরাজিত বীর ইকারুসের মর্যাদা পায়। একঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা বিমলচন্দ্র ঘোষের রচনায় অবলীলাক্রমে পাখা মেলে। নগর জীবনের দৈনন্দিন সংগ্রামের ভিতরে এই যে রঙ-রসের স্পর্শ, প্রশ্ন জাগে—সমর সেনের কাব্যচর্চায় তুলনীয় কোনো অভিজ্ঞতার সন্ধান মেলে না কেন? নেতির চাপে জীবন সেখানে প্রায়ই মুহ্যমান—

তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষপ্রান্তে

করাল শূন্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে,
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। ('রোমন্থন')

নিখিল নাস্তির দর্শন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিম্বা বুদ্ধদেব বসুর রচনায় অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সমর সেন !! সাম্যবাদী কবি হিসাবে যাঁর প্রতিষ্ঠা, আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে যাঁর ঘোষণা—'আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট' ('২২ শে জুন')—এই ধরণের মনোভাবের বলি হওয়া তাঁর পক্ষে কতখানি স্বাভাবিক? এই প্রশ্ন—এবং তার তাৎপর্য—সমর সেনের কবিতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর সমসাময়িকদের মনেও জেগেছিলো। উদাহরণ একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি মারফৎ পেশ করি—

'সমর সেনের কাছে অভিযোগ করলে অন্যায় হবে না যে তাঁর লেখায় এক এক সময় সত্যই নৈরাশ্যের একটা বিকৃত সুর বেজে ওঠে, আর তাঁর অনুরাগীদের মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো তিনি প্রায় আড়চোখে আর্তসমাজের দিকে তাকিয়ে শুধু বহুজনের ব্যক্তিগত বিপত্তির ভিত্তিতে কাব্য রচনা করছেন, মার্কস-পন্থীর পক্ষে যা অকর্তব্য। ·····সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার নানাগুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে' ('আধুনিক বাংলা কবিতা', প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা: হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃ ১॥ ৯০)।

উদ্ধৃতিতে বিশেষ কোনো কবিতার উল্লেখ না থাকলেও সমর সেনের রচনায় বক্তব্য ও বিষয়বিন্যাসের অসঙ্গতির প্রবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঘরে বাইরে' কবিতাটির নাম করা যেতে পারে, ইস্পাতের মতো উদ্যত দিনের আবির্ভাব কামনা করে যার অন্তিম স্তবক পূর্বেকার পংক্তিবিন্যাসের অনিবার্য পরিণাম কিনা সে-সম্পর্কে সন্দেহ থাকে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আজ আর কেউ উত্থাপন করবেন কিনা জানি না। মনে রাখা প্রয়োজন, শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা কালেও কিন্তু 'মিছিলের মুখ' কিম্বা 'সালেমানের মা' গোত্রের রচনা

সমর সেনের লেখনী প্রসব করেনি। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চারিদিকে যখন এত দৈন্য, অপূর্ণতা, তখনো উক্তি ও উপলব্ধিতে বিপ্লবী প্রত্যয় অবৈকল্য রাখে কি ক'রে? সত্তর দশকের শুরুতে বিষ্ণু দের এক মূল্যায়নে পরিপ্রশ্ন করেছিলেন সমর সেন। ডায়েলেকটিক্স বোধ এখানে শিল্পকর্মের শিকড় স্পর্শ করে। প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন চারিত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও দাম্পত্য ধর্মে মিলিত হয়, কিম্বা সমবেত নৃত্যকলাপ্রদর্শনীতে শিল্পীবিশেষের অঙ্গসঞ্চালন যেমন সমগ্র অনুষ্ঠানের শোভাবর্দ্ধন করে, তেমন স্বধর্মে স্থিত হয়ে আমরা সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। এলিঅটের কবিতায় এই চেতনার অভাব লক্ষ্য করেছিলেন বিষ্ণু দে (*What Krishna Meant : An Essay on T. S. Eliot*)। সমর সেনের পূর্বোক্ত জিজ্ঞাসার জবাবে ঐ নিবন্ধের যুক্তিবিশ্লেষণ বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ পরিস্থিতি এবং প্রেম (সঠিকভাবে প্রেমচেতনার অভাব) উপলব্ধিতে এলিঅটের সঙ্গে সমর সেনের মিল যথেষ্ট, যদিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশিবির এবং উপনিবেশিক পটভূমিকায় প্রভেদ অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত।

সমর সেনের কবিতায় বক্তব্য এবং বিষয়বিন্যাসের মধ্যে যে অসঙ্গতি মাঝে-মাঝে দেখা যায় তার মূলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাবর্জিত বিপ্লবী মানসিকতা, জীবনযাত্রা এবং যুক্তিলব্ধ প্রত্যয়ের পার্থক্য অতিক্রম ক'রে যা কখনোই অখণ্ড উপলব্ধিতে পৌঁছতে দেয় না। বিপ্লবের সময়ে আন্দোলনকারী জনগণের মানসিকতা সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের থেকে পৃথক হ'তে বাধ্য—গোর্কিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। সমর সেনের কবিতার চরিত্র চেনাতে এর চেয়ে যথার্থ উক্তির সন্ধান পাওয়া শক্ত—

There is a divergence of mood between people, who are engaged in politics or are absorbed in a struggle of the most furious kind, and the mood of a man who has artificially driven himself into a situation where he can't observe the new life, while his impressions of the decay of a vast bourgeois capital are getting the better of him.

(Lenin On Art And Literature—Progress Publishers, Moscow, 1967, p 207)

সাম্প্রদায়িক অবক্ষয়ের মুহূর্তে তিমিরবিনাশী 'তমস'

মিতা নাগ

কিছুদিন পূর্বে সদ্যসমাপ্ত দূরদর্শন ধারাবাহিক 'তমস'-কে ঘিরে দেশ-ব্যাপী শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা, সমালোচনা। বাদ যায়নি কেউ—বুদ্ধিজীবি মহল থেকে আরম্ভ করে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, কৃষক, চাকুরিজীবি এমনকি ছাত্রসমাজ পর্যন্ত গড়িয়েছে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ, বিতর্কের অবসান ঘটাতে এগিয়ে আসতে হয়েছে আদালতের আইনজীবি সম্প্রদায়কেও। ঝড় উঠেছে বিভিন্ন ভাষার পত্র পত্রিকাগুলিতেও। বিগত বছরে বাংলার শিক্ষিত সমাজে ঠিক এমনই এক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল 'পরমা' চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রশ্ন ছিল নান্দনিক ও সামাজিক। 'পরমা'-কে নিয়ে বিতর্কের পরিধি ছিল ক্ষুদ্রপরিসর—একমাত্র বাঙালী সমাজকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছিল চাঞ্চল্য। কিন্তু 'তমস'-এর বিতর্কবৃত্তের পরিধি বৃহৎ; প্রশ্ন জেগেছে নান্দনিক, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক, কেন্দ্রমূলে আহূত হয়েছে ভারত উপমহাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী—নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা সম্প্রদায়ের, নানা সংস্কারে আবিষ্ট মানুষ। 'তমস'-কে ঘিরে আজকের সবথেকে গুরুত্ব-পূর্ণ জিজ্ঞাসা এই যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ যা সারা সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তাকে নিষ্ক্রিয় করার ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকের ভূমিকা কতখানি? 'তমস'-এর তিমিরবিলাসী ঐতিহাসিক সত্য কি অদূর ভবিষ্যতে নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজকের এই আলোচনা, সমীক্ষা-প্রতিবেদন।

১৯৪৭-এর দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জালালাবাদ নামে ছোট শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিকে ঘিরে জ্বলে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিধ্বংসী আগুন, আত্মাহুতি দিয়েছিল শত শত নিষ্পাপ, নিরাশ্রয় মানুষ। এই ঘটনার সত্যকে উপন্যাসে রূপ দিয়েছিলেন লেখক ভীষ্ম সাহনী ও তাকে অবলম্বন করেই পরিচালক গোবিন্দ নিহালনি নির্মাণ করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'তমস'। দেশবিভাগ কেন সাম্প্রদায়িক গণ-হিংসা ও গণবিস্ফোরণের জন্ম দিল? ভারতের স্বাধীনতা-ইতিহাসের এই সমাধান-বিহীন জিজ্ঞাসার উত্তর উন্মোচন করেছে এই ধারাবাহিক অতি বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায়। দাঙ্গার সূত্রপাত কোথায় এবং কেন এ বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকা সম্ভব। সাংবিধানিক ভাষায় ভারতকে সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতের সাধারণ জনগোষ্ঠী এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে তা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। যে দেশে একাধিক ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস, সেখানে একজন যাকে বলে 'ধর্ম' অপরের কাছে সেইটাই হয়ে দাঁড়ায় 'অধর্ম' এবং সেখানে থেকেই ধর্মবিরোধের সূত্রপাত। আর এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ, জন্ম নেয় দাঙ্গা। 'তমস'-এর আঁধারের শুরুও এইভাবেই—যখন নাথুকে দিয়ে হিন্দু দলপতি শুয়োর মারিয়ে ফেলে রাখে মসজিদের সামনে এবং দাঙ্গা বাধায় ঐ ছোট্ট শহরে। নাথুর নিঃসীম অন্তর্দাহ ও অনুশোচনা, অসহায় মানুষের অকারণ অপরাধবোধ এক সৎ বিবেকের উন্মোচন ঘটায়। 'তমস' মানুষের বিবেকের বাণী শুনিয়েছে, মানুষের মর্মের কথা বলেছে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাবে বিবেকবোধ এবং মানবিকতা যখন লুপ্ত হয়ে যায়, হিংসা আক্রোশের পাশবশক্তি মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে—তখনই জন্ম নেয় এমন তমসাচ্ছন্ন ট্র্যাজেডি।

রাজনীতির ইতিহাসই এই চলচ্চিত্রের মূল বিষয়। চলচ্চিত্রের পর্দায় অনিবার্যভাবে প্রাধান্য পেয়েছে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে ঘিরে রাজনৈতিক পটভূমিকা। পরিচালক খতিয়ে দেখেছেন জনমানসে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের সুদূরপ্রসারী প্রভাব। রাজনীতিবিষয়ক নানান উপাদান, তর্কবিতর্ক, আলোচনা উপন্যাস-টিতে ছড়িয়ে থাকে এবং পরিচালক অসামান্য নৈপুণ্যে ও শিল্পদক্ষতায় তাদের সংস্থাপিত করেন। অথচ রাজনীতির ইতিহাস কখনও এই ধারাবাহিকে প্রাধান্য পায়নি—এখানেই কাহিনীর আকর্ষণ, উপস্থাপনার অনবদ্যতা। রাজ-

নীতি অপেক্ষা মানুষের জীবনের কাহিনী, তাদের ঘাত-প্রতিঘাত, আঘাত-সংঘাত, আশা-নিরাশা, ব্যর্থতা-সার্থকতাই এখানে প্রধান উপজীব্য বিষয়। রাজনৈতিক নামাবলীর চেয়ে দর্শকদের মনে বেশী দাগ কেটে যায় নাথু, কারমো, হরনাম, বানো, বকশিজি, জার্ণেল সিং, হায়াৎ খান, ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার ও তার হৃদয়বতী স্ত্রী, তাদের স্বীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঔজ্জ্বল্যে।

এই কাহিনীচিত্রে চরমপন্থী হিন্দুদের প্রকাশ্যভাবে দেখানো হয়েছে—এই অভিযোগের বিরুদ্ধে পরিচালকের বলিষ্ঠ উত্তর: 'আমি চরমপন্থী হিন্দুদের খোলাখুলি দেখিয়েছি কেননা আমার উদ্দেশ্যই ছিল দেখানো কীভাবে প্রত্যেকটি গোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য ও পুরাণকে ভাঙিয়ে বৈরিতার আবহ গড়ে তুলেছে। কেউ বাদ যায়নি, হিন্দুরা করেছে তাদের পন্থায়, মুসলমানরা এবং শিখরাও। ধর্মের খণ্ডিত ব্যবহার করে এরা ধর্মবিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছিল যার পরিণতি অবশ্যই হিংসা আর বিপর্যয়। বাস্তবে এটাই ঘটেছিল, এবং পর্দায় আমি তা দেখিয়েছি।' শিল্প সমন্বিত এই ছবির বিরুদ্ধে 'ইয়াপি' শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা হলে পরিচালক গোবিন্দ নিহালনি এই একই সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট জানালেন, 'এ ধরণের প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে যে আমাদের মধ্যে একটি শ্রেণী আছে—এলিটের অঙ্গ—যারা প্রগতির, এমনকি বিপ্লবেরও কথা বলে কিন্তু আসলে তারা দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাতমুখী।' এমন একজন 'প্রগতিবাদী' সমালোচক বোম্বাইয়ের একটি কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ ছবি যে সর্বনাশ ঘটাতে পারত, তা ঘটেনি।" কিন্তু কেন, ঈশ্বরকে কেন? সাধারণ মানুষকে কেন নয়, তারাই তো তাদের বুদ্ধি ও মূল্যবোধ দিয়ে 'তমস'-এর মতো 'বিপজ্জনক' ছবি দেখেছে এবং দেখেও সাম্প্রদায়িকতায় মেতে ওঠেনি। পরিচালক এই বুদ্ধি আর মূল্যবোধকে মূল্য দিতে চেয়েছেন। [আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা মার্চ, ১৯৮৮]

শিল্প-সাফল্যের এক বড় হাতিয়ার অভিনয় দক্ষতা। এই প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, 'তমস'-এর সার্থকতার মূলে শিল্পীদের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। পত্র-পত্রিকা ও সমালোচক মহলের কাছ থেকে তাঁরা যোগ্য-স্বীকৃতি অর্জন

করেছেন কিনা তা মতদ্বৈধের অপেক্ষা রাখে কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের রূপায়ণে সাধারণ দর্শকমণ্ডলীর মনে তাঁরা যে ছাপ ফেলেছেন সেখানেই সৃষ্টি হয়ে থাকবে অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসাবে তাঁদের বড় 'ইমেজ'। আমরা কি ভুলতে পারি সেই মর্মান্তিক দৃশ্য—কারমোর একপাশে বিধ্বস্ত নাথু ঘুমোচ্ছে, ক্লান্তিতে অবসাদে শরীর বেঁকেচুরে গিয়েছে, তারই পাশে নাথুর মায়ের কণ্ঠস্বরে আসন্ন মৃত্যুর গোঙানি। ঠিক এমনই বিচলিত হয়ে পড়ি সেই দৃশ্য দেখতে গিয়ে যেখানে গৃহহারা দুই বৃদ্ধ শিখ দম্পতি হরনাম-বানো চোখের সামনে তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হতে দেখে গাছের আড়ালে চমকে চমকে ওঠে, পথে শত্রু মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নিতে এসে বৃদ্ধ হরনাম ভেঙে পড়ে কান্নায়। সমস্ত কাহিনীচিত্র জুড়ে কারমোর চরিত্র ছেয়ে থাকে এক মমতাভিষিক্ত, নিরুপায়, নিষ্কম্প, বিষাদক্লিষ্ট পাষাণ-প্রতিমার মতো। কিন্তু এতো নিছক কল্পনা নয়, চল্লিশ বছর আগে আমাদের পিতা পিতামহের প্রত্যক্ষ করা দৃশ্যেরই অবিকৃত প্রতিফলন। 'তমস' ইতিহাসের অতিবাস্তব, শুদ্ধ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। ব্যক্তি এবং ইতিহাসকে মেলানোর যে দায় এই শ্রেণীর চলচ্চিত্রের লক্ষ্য তার অনেকটাই সম্পন্ন করেছেন পরিচালক। এবং সেই কারণেই 'তমস' হয়ে উঠেছে একটি 'কমিটেড ফিল্ম'—চিত্তবিনোদন নয়, চিত্তজাগরণ যার মূল প্রয়াস। তার নিশানা খুবই স্পষ্ট—সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আবেগ ও বোধকে জাগিয়ে তোলা। প্রত্যেকে বিবেকবান মানুষেরই অন্যতম সামাজিক কর্তব্য সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদে সর্বাত্মক ও সর্বাঙ্গীণ সচেতনতাকে তীব্র করে তোলা। সেদিক থেকে 'তমস' সচেতনতার উদ্বোধনে এক বড় অস্ত্র। 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার 'তমস' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক অরুণ সেনের সঙ্গে আমরাও সহমত, 'এটা যেমন সাম্প্রদায়িকদের আক্রমণস্থল, তেমনি ভারতের অসাম্প্রদায়িক জাগ্রতচেতন মানুষের গৌরবের ঝাণ্ডা।'

'তমস'-এর পর তামস আজ কেবল দূরদর্শনের পর্দা বা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ নয়, 'তমস'-এর অভিশাপ শুধুমাত্র কারমোর নবজাত শিশুর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ নয়। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে হতভাগ্য কারমোর ভাগ্যসূত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাম্প্রদায়িকতার বিষে

জর্জরিত, জিঘাংসায় উন্মত্ত, বর্ণবিদ্বেষে ও রাজনৈতিক সংঘাতে ক্লিষ্ট-পিষ্ট আশি কোটি ভারতবাসীর ও আগামী প্রজন্মের দোদুল্যমান ভবিষ্যৎ। কুশীলব পাল্টেছে, পরিবর্তন ঘটেছে পটভূমির, কিন্তু মানুষের বাহ্যিক আবরণে আচ্ছাদিত অন্তরের তমসা কি দূর হয়েছে? ইতিহাসের গতি আজও শেষ হয়নি, মানুষ বহু মত, বহু প্রজ্ঞা, বহু ধর্মনায়ক আর রাষ্ট্রনায়কের অনুগমন করে চলেছে কালকালান্ত ধরে। সে হয়তো অনেক পেয়েছে, তবু কি সব পাওয়া হয়েছে তার? কোথাও কি দেখা দিয়েছে অনির্বচনীয় স্বপ্নের সফলতা, শুভ্র মানবিকতার ভোর? এর উত্তর মেলেনি। তবু সেই প্রত্যাশিত আগামী সম্ভবের আশায় 'তমস' আমাদের শোনাক 'সূর্যতামসীর' তিমিরহননের গান:

'নব নব মৃত্যুশব্দ, রক্তশব্দ, ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ঘাট বসন্তের তরে।
সেইসব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষয় হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়'।

সদ্য প্রকাশিত

প্রখ্যাত রসায়নবিদ

ডঃ প্রতুল চন্দ্র রক্ষিতের রম্য রচনা

এপিঠ ওপিঠ

দাম: ১২ টাকা

শরৎ বুক হাউস

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৩২-৩৭০০

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী প্রচেষ্টা—১

লেখক ব্যাঙ্ক

সেইসব লেখক যাঁরা নির্জনে চুপচাপ লিখে যান, কিংবা কোন লেখা কোন পত্রিকায় প্রকাশ করবেন বুঝতে পারেন না, কিংবা সঠিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে না, সেইসব লেখকদের জন্য তৈরি হলো লেখক ব্যাঙ্ক। বহির্বঙ্গের লেখকদের যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠুক লেখক ব্যাঙ্ক। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের কাছে লেখা পৌঁছে দিতে তৈরি হলো ব্যাঙ্ক। আপাতত লেখক ব্যাঙ্ক শুরু হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ী নিবন্ধ, ছোট-গল্প, মৌলিক গদ্য, অনূদিত গল্প-কবিতা নিয়ে। আপনার প্রিয় লেখাটি নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী প্রচেষ্টা—২

লিটল ম্যাগাজিন ডাকঘর

১৯৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ডাকমাশুল বেড়েছে। এর জন্যে সবচেয়ে বেশী আর্থিক ঝুঁকি বেড়েছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের। এ নিয়ে প্রতিবাদ চিঠি-চাপাটি সবই হয়েছে। কিন্তু এদেশে প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান মাত্র। প্রতিবাদ, তা যতই সাংগঠনিক হোক না কেন, যাদের বিরুদ্ধে তা, তারা কালা অথবা দু কান-কাটা প্রতিবন্ধী। পাল্টা প্রতিবাদ হিসেবেই গড়ে তুললাম এই ডাকঘর। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের কাছে আবেদন আপনাদের পত্রিকার লেখককপি লেখকের নামসহ লাইব্রেরীতে জমা দিতে (কলকাতা ও কাছাকাছি জেলার লেখকদের ক্ষেত্রে)। এখান থেকে নির্দিষ্ট লেখক তার সংখ্যাটি সংগ্রহ করবেন। পত্রিকা জমা দেবার ও নেবার সময় নিম্নরূপ:

মঙ্গলবার: বিকেল ৪—৬টা
শনিবার: দুপুর ২—৬টা
রবিবার: সকাল ৯.৩০—১২টা

লেখক ব্যাঙ্ক
প্রযত্নে: সন্দীপ দত্ত
লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্র
১৮/এম্ ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অন্তরীপ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র
তৃতীয় বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ ১৯৮৮

সূচি

☐ সম্পাদকীয় ১

☐ বিদেশী কবিতা প্রসঙ্গ
মরিস কারেমের কবিতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২

☐ স্মরণীয়েষু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৪

☐ সমরেশ বসু : প্রয়াণসূত্রে
আমার লড়াই অন্ধকারের বিরুদ্ধে : সমরেশ বসু : ব্রত চক্রবর্তী ৭
নিয়ম-ভাঙ্গার কারিগর : গৌতম সেনগুপ্ত ১১

☐ সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য
অ-প্রাতিষ্ঠানিক অমিয়ভূষণ : কাহিনী ও কথায় : দীপক মিত্র ১৪

☐ নিবন্ধ
কাব্যসাহিত্য, সত্যেন্দ্রনাথ : জীবনানন্দ দাশ ২৯

☐ প্রবন্ধ
পিঙ্গল প্রহার : নিখিলেশ গুহ ৩৪

☐ দূরদর্শন-ধারাবাহিক : একটি সমীক্ষা-প্রতিবেদন
সাম্প্রদায়িক অবক্ষয়ের মুহূর্তে তিমিরবিনাশী 'তমস' : মিতা নাগ ৪৪

☐ নির্বাচিত কবিতা
অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমোদ বসু সুজিত সরকার বিশ্বনাথ গরাই
সুভাষ মজুমদার গৌতম সেনগুপ্ত বিবস্বান ভট্টাচার্য অসিত মৈত্র
মলয় দে অর্ণব রায় শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায় ২১-২৮

যোগাযোগ

৫, খেলাত বাবু লেন, ককাতা-৩৭, দূরভাষ : ৫৫-৫০০৭

☐ চার টাকা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ৫, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা-৩৭ হইতে প্রকাশিত ও 'সোম প্রিন্টার্স' ৭, কানাই লাল চ্যাটার্জী স্ট্রীট, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬ হইতে মুদ্রিত।